দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ৪র্থ সংখ্যা ❖ ২ জুলাই ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরেও যুদ্ধ অব্যাহত আছে ২
- গাজার শেষ দিনগুলো ৩
- ভারতের কণ্ঠস্বর শোনানোর জন্য এখনও খুব বেশি দেরি হয়নি ৬
- নিউইউর্কে মেয়র পদের জন্য মামদানির উত্থানে ভীত হয়ে পড়েছেন মহামতি ট্রাম্প ৭
- সেন্সাস দেরি হলে কি ক্ষতি, কেনই বা দেরি ? ৯
- এলোমেলো কথা : কদিন বাদে স্মরণ করা হবে ইরান এক সময়ে ছিলো প্রাচ্যের বা আসার সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র ১০
- জাতীয় জরুরি অবস্থার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তির প্রাসঙ্গিকতা ১২
- পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতির দাবি হাতে হাতে কাজ চাই পাতে পাতে ভাত চাই ১৪
- কালিগঞ্জে ও দক্ষিণ কলকাতার ঘটনায় অভিযোগের তীর শাসক দলের দিকে ১৬
- জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার অবস্থান ১৭
- দেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার আগে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান যুক্তিবাদী মানুষেরা গর্জে উঠুন ২১
- আঁধার রাতে মশাল নিশান ২২
- পুরনো লেখা ফিরে পড়া : কার্ল মার্কসের ধর্মচিন্তা ২৩
- স্বাধীনতা সংগ্রামী , আইনজ্ঞ ও মহান দানবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ২৬

➲সম্পাদকীয়

বিদেশ নীতির বিপর্যয়

পহেলগামের উপত্যকায় ২২ এপ্রিল ২৬ জন নিরীহ মানুষের মর্মান্তিক গণহত্যার পর ভারত সরকার ও উগ্র জাতীয়তাবাদী গদি মিডিয়ার মিথ্যা প্রোপাগান্ডায় মনে হয়েছিল পাকিস্তানের আর কোনও অস্তিত্বই থাকবেনা। যখন পাকিস্তানের গভীরে সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে ভারত আক্রমণ চালিয়েছিল, তখন তারপাশে কোনো দেশ ছিল না। 'শুধুমাত্র দুটি অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ, রাশিয়া এবং ফ্রান্স, কিছু মামুলি মন্তব্য করেছিল, কিন্তু বিশ্বের বাকি ৮৮ দেশ যেখানে মোদি সফর করেছেন (কিছুক্ষেত্রে, বহুবার) নীরব দর্শক ছিল।

আমাদের বিদেশ মন্ত্রক ভুল হিসাব করেছিল। বিদেশ মন্ত্রক বিদেশে প্রতিটি ভারতীয় মিশনকে হিন্দু মৌলবাদের এক একটি সম্প্রসারণ শিবিরে পরিণত করতে ব্যস্ত ছিল।

পশ্চিমাদেশগুলোতে ভারতীয়দের সাধারণত শান্ত, অথচ কঠোর পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে দেখা হতো, মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের মতো নয়। হিন্দু ধর্মকে কম স্পষ্টবা। কম বিঘ্নিতকারী বিদেশী ধর্ম হিসেবে দেখা হতো। এখন আর তা নয়।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর সাধারণত তার অযাচিত-আক্রমনাত্মক বিবৃতিগুলি তিনি যে দেশগুলিতে যান সেখানেই প্রকাশ করেন। ভারত বিশ্ব শান্তি ও গণতন্ত্র নিয়ে যে উচ্চ-উচ্চাকাঙ্ক্ষী নীতি ও বিবৃতি দেয়, যার বিদেশী বিশ্বাসযোগ্যতা সর্বনিম্ন, তাদেখে বিশ্ব টিটকারি মারে। একটিও দেশ ভারতের বন্ধু নয় এবং এমনকী পাকিস্তানেরও অন্তত তিনটি শক্তিশালী সমর্থক রয়েছে , যার মধ্যে দুটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের বিদেশ নীতির এমনই সাফল্য যে রাষ্ট্রপুঞ্জ পাকিস্তানকে বিশ্ব সন্ত্রাস বিরোধী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আর তালিবান বিরোধী কমিটিব . চেয়ারম্যান করেছে। IMF ও ADB ভারতের আপত্তি সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণে ঋণ দিয়েছে।

ট্রাম্প ২.০ ভারতের জন্য একটি অপূরণীয় বিপর্যয়, কিন্তু কানাডা, মেক্সিকো এবং এমন কি ব্রাজিলের মতো ছোট দেশগুলি যখন তাকে জবাব দিয়েছিল , এবং চীন তাকে টেক্কা দিয়েছিল ও সাহস দেখিয়েছিল, তখন ভারতকে একটি দুর্বল ক্রন্দনকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে। আমাদের কোনো প্ল্যান বি নেই । ট্রাম্প অন্তত ১৬ বার বলেছেন যে বানিজ্য বন্ধ করে দেবো বলে তিনি দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি করিয়েছেন । মোদী নিশ্চুপ । মোদী গত ১০ বার মার্কিন মুলুকে গিয়েছেন ।' আপ কি বার ট্রাম্প সরকারের' ডাক দিয়েছেন।

'নমস্তে ট্রাম্প' করেছেন। তাও চিঁড়ে ভেজেনি । ট্রাম্প এখন পাক জেনারেল আসিম মুনিরের সঙ্গে খানা পিনা করছেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন , গাজায় ইসরায়েলের নির্মূল কর্মসূচির প্রতি তার অশুভ সমর্থন বিশ্বজুড়ে বিবেকবান নাগরিক এবং দেশগুলিকে বিরক্ত করেছে। এই কারণেই ভারত কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যা আগে কখনও হয়নি। ৩২টি দেশে সাতটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের ভ্রমণের দ্বারা বিশ্বের ভারতের পক্ষে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে কি ?

দূরবর্তী কঙ্গো, গায়ানা, বালাটভিয়ার মতন ৩২টি দেশ কি ভারতের জন্য এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাততালি দিতে রাজি হয়েছিল ?

জনগণের টাকার বিনিময়ে বিশ্ব ভ্রমণের বৃহত্তম সংসদীয় অনুশীলন।

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ●ফোন : 80178 04019 / 94340 22512 ● ওয়েবসাইট : nagorik.co.in

ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরেও যুদ্ধ অব্যাহত আছে

সৌর বসু

বিগত ২০ জুন ইরানকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেছে ইসরাইল। এই আক্রমণের ফলে ইরানের বেশ কয়েকটি পারমাণবিক স্থাপনা এবং সামরিক স্থাপনা আক্রান্ত হয়েছে। ইরানের দুজন পরমাণু বিজ্ঞানী ফেরেই দুন আব্বাসি এবং মুহাম্মদ তেহেরানচিকে এই আক্রমণের ফলে নিহত হয়েছেন। কয়েকজন সামরিক জেনারেল প্রাণ হারিয়েছেন। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতা নিয়াহু জানিয়েছেন যে এই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের কারখানা গুলি। ইসরাইল যেদিন ভোরে ইরান আক্রমণ করে সে সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিলেন ক্যানাডাতে G7 বৈঠকে ।

ট্রাম্প তড়িঘড়ি করে যুদ্ধের কারণে বৈঠক থেকে ওয়াশিংটনে ফিরে আসেন। ইসরাইল, কিন্তু আমেরিকার অনুমতি ছাড়াই ইরানে বোমাবর্ষণ শুরু করে। হঠাৎ ইসরাইল একতরফাভাবে এই আক্রমণ কেন শুরু করলো ? ইসরাইলের বক্তব্য নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করার দিকে ইরান অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। হয়তো এক বছর কিংবা কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের হাতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র চলে আসতে পারে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েল ইরানকে আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। ইসরাইলের প্রধান মন্ত্রী নেতানিয়াহু জানিয়েছেন তাদের এই আক্রমণ প্রতিরোধমূলক। অন্যদিকে ইরানের বক্তব্য তারা শান্তিপূর্ণ কাজের জন্য নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরি করতে চায়। ইরান পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণ রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষরিত একটি দেশ। যদিও আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা জানিয়েছে যে অস্ত্র রোধ সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা অবলম্বনে ক্ষেত্রে ইরান ব্যর্থ হয়েছে। এই অভিযোগ অবশ্য ইরান প্রত্যাখ্যান করেছে, এই সংস্থাটি ইরানের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ আনলেও কখনই বলেনি যে ইরান পারমানবিক অস্ত্র তৈরি করে ফেলেছে। ইসরাইল প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও এ কথা কারো অজানা নেই যে ইসরাইলের কাছে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোনেও দেশ পরমাণু অস্ত্রধর হয়ে উঠুক ইসরাইল সেটা কখনোই চায় না। তাহলে পশ্চিম এশিয়ায়, ইসরাইলের একাধিপত্য থাকবে না। ২০১৫ সালে ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলো, চীন এবং রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তির অংশ হিসেবে তার পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত রাখতে রাজি হয়েছিল। এছাড়া আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থাকে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা গুলি নিয়মিত পরিদর্শনের অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছিল। এর বিনিময়ে ইরানের, উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছিল। যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম দফায় ক্ষমতায় এসে ইরানের উপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো এমন কোন তথ্য পায়নি যার দ্বারা প্রমাণিত হয় ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ডিরেক্টর তুলসী গাবারড জানিয়েছেন , ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী ২০০৩ সালের পর ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি অনুমোদন করেন নি।

ইতিপূর্বে বিগত প্রায় কুড়ি মাস ধরে ইসরাইল বোমা বর্ষণ করে ফিলিস্তিনিদের নির্বিচারে হত্যা করে, গাজা ভূখণ্ডকে একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। ৫৫ হাজার মানুষ গাজাতে নিহত হয়েছেন, ইজরায়েলের বর্বরোচিত আক্রমণে। নিহতদের মধ্যে প্রায় ৭০% শিশু এবং নারী। এছাড়া কত যে মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছেন ,সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন তার কোনেও ইয়ত্তা নেই। গাজা ভূখণ্ডে রাস্তায় ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে, এবং যা নিয়ে কুকুরেরা টানাটানি করছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসেছেন এবছরের ২০ জানুয়ারি। এই ছয় মাসে তার উদ্ভট সিদ্ধান্তের কারণে বিশ্ব জুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার আগে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বলেছিলেন যে, তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যে যুদ্ধ চলছে ,তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেবেন ।পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করাই তার অন্যতম লক্ষ্য । কিন্তু ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে তিনি প্যালেস্টাইনে ইসরাইল কর্তৃক অবিরাম বোমাবর্ষণ এবং অসামরিক ফিলিস্তিনিও নাগরিকদের হত্যা লীলা সমর্থন করছেন। সেইসঙ্গে গাজা ভূখণ্ডকে ফিলিস্তিন মুক্ত করার নির্দেশ জারি করেছেন। গাজা ভূখণ্ড ফিলিস্তিন মুক্ত হলে সেখানে একটি প্রমোদ নগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে আমেরিকা এবং ইসরাইলের।

২০২৩ সালের হামাস কর্তৃক ইজারাইল আক্রমণের পর এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর ইসরায়েল, আমেরিকার সহায়তায় লেবাননকে শায়েস্তা করেছে। সিরিয়াতে আসাদ সরকারের পতন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। তার ফলে ইরান, হিজবুল্লাহ, হামাস, হুটিস প্রমুখ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করে, ইসরাইলকে যেভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল, তার সম্ভাবনা অনেক কমে গেছে। হামাস , হুটিস দুর্বল হয়ে যাবার ফলে ইহুদীদের মনে হতে শুরু করেছে যে পশ্চিম এশিয়াকে নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ তাদের সামনে এসেছে এবং ইরানের আয়াতোল্লাহ খোমেনীর শাসনব্যবস্থা কে সরিয়ে দেওয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। তবে তার জন্য

দীর্ঘকালীন যুদ্ধের প্রয়োজন এবং ইসরাইলের একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সহায়তার প্রয়োজন।

ইসরাইলের অভ্যন্তরে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জমা পড়েছে।হামাস কর্তৃক আক্রমণের ফলে নেতানিয়াহুর ব্যর্থতার জন্য ইজরায়েলের এক হাজারের বেশি মানুষ নিহত হন। এছাড়াও নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ। তার ফলে নেতানিয়াহুর আসন টলোমলো। এই পরিস্থিতিতে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়া নেতানিয়াহুর পরিত্রান পাবার অন্যতম উপায়। ইরানের সঙ্গে এই যুদ্ধের ফলে নেতানিয়াহুর বিরোধী রাজনীতিকরা, তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। ইরানকে ইসরাইলের আক্রমণ করার এটাও অন্যতম কারণ।

ইসরাইল এবং ইরানের যুদ্ধ বিষয়ে ইউরোপীয় দেশগুলো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। জেনেভাতে রাষ্ট্রপুঞ্জ ,ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। এই বৈঠকের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে পশ্চিম এশিয়ার ভবিষ্যৎ।

ইসরাইল এর আক্রমণের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন তিনি যুদ্ধে যোগদান করবেন কিনা সে ব্যাপারে মনস্থির করেননি। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দুসপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন। জনসমক্ষে তার এই ঘোষণার দুদিনের মাথায় তিনি ইরান আক্রমণ করে বসেন। রবি বার সকালে পেন্টাগানের প্রতিরক্ষা সচিব পিটহেগসেথ ঘোষণা করেন যে ‘শুক্রবার মধ্যরাতে পূর্বাঞ্চলীয় সময়ে অভিযানটি শুরু হয় ক্ক২ বোমারু বিমান গুলি

মিসৌরী থেকে ১৮ ঘন্টার যাত্রা শুরু করে’। বিমান গুলি ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনা কেন্দ্র Fordow–Nantaz এবং Isfahan, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করে। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বাঙ্কার ধ্বংসকারী বোমাটি স্থাপনা কেন্দ্রগুলির উপর ফেলা হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে এর ফলে ইরানের ভূগর্ভস্থ কেন্দ্রগুলি যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যা দাবী করছেন তা সঠিক নয়। ইরানের বক্তব্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি সঠিক নয়। কে যে সঠিক সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই আক্রমণ , একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সূচনা বলে অনেকেই মনে করছেন। ইরান কে আক্রমণ করার পর গভীর রাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ভাষনে বলেন, ‘ মধ্যপ্রাচ্যের দালাল ইরানকে এখন শান্তি স্থাপন করতে হবে। যদি তারা ,তা না করে, তাহলে ভবিষ্যতের আক্রমণগুলি অনেক বেশি ঝাঁঝালো হবে।’

ইরান একটি লড়াকু দেশ। তাদের দেশপ্রেম প্রবল। পারস্য সভ্যতা অতি প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর থেকে এই সভ্যতা আজও বর্তমান। ইরান যদি যুদ্ধ চালিয়ে যায়, তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পৃথিবীতে, শান্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি মাঠে মারা যাবে।

ইরান বলেছে তারা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার কথাচিন্তা করছে। হরমুজ প্রণালী হল একটি সরু জলপথ,পারস্য উপসাগর এবং ওমান উপসাগর মধ্যে। এই সামুদ্রিক পথটি আন্তর্জাতিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তেল ট্যাঙ্কারগুলি এই পথ দিয়ে প্রতিদিন এক কোটি ৭০ লক্ষ ব্যারেল তেল পরিবহন করে। বিশ্বের মোট ব্যবহার্য তেলের এটি কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ। এই প্রণালী বন্ধ করে দিলে, তেলের দাম হু হু করে বৃদ্ধি পাবে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এশিয়ার দেশগুলি, যার মধ্যে ভারত পাকিস্তানের মতো গরিব দেশ এবং চীন ও জাপানও আছে।

কিন্তু এই প্রণালী বন্ধ করা সহজ কথা নয়। ইরানের তেলও এই পথেই রপ্তানি হয়। প্রণালী বন্ধ করে দেওয়া হলে, ইরানের আয় অনেক কমে যাবে। আমেরিকাও ছেড়ে কথা বলবে না। সুতরাং মনে হয় ইরান হয়তো সে পথে যাবে না। আমেরিকাকেও ,ইরান প্রতি আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না। আমেরিকা অনেক বেশি শক্তিশালী দেশ। তাছাড়া আমেরিকার পশ্চিম এশিয়ায় ১৯ টি মিলিটারি ঘাঁটি এবং, ৩০ হাজার সৈন্য রয়েছে যেগুলোর অবস্থান ইরানের ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল স্থাপনার খুব কাছাকাছি। ইরান কিন্তু এখনো অধি এই ঘাঁটি গুলি আক্রমণ করেনি।কারণ মনে হয় ইরান দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধের মধ্যেই থাকতে চায়। অন্যদিকে আমেরিকার ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ যে আঁতাত আছে তার সদস্যরা চায় না আমেরিকার সৈন্যরা বিদেশে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক। তাদেরকে উপেক্ষা করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে যুদ্ধে এগনো সম্ভব নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মূল উদ্দেশ্য ইরানকে পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে না দেওয়া। সে ক্ষেত্রে ইরান যদি আমেরিকার সঙ্গে কোন চুক্তিতে আসতে পারে তাহলে পশ্চিম এশিয়ার এই যুদ্ধ বেশিদূর গড়াবে না। মঙ্গলবার সকালে শুনলাম ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরাইল এবং ইরানের সঙ্গে আলোচনা করে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তার যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পরেও যুদ্ধ অব্যাহত আছে। তবে এই যুদ্ধ আর বেশিদূর অগ্রসর হবে বলে মনে হয় না। আমরা সেই শুভ কামনা করতে পারি। অন্যথা পৃথিবী ভয়ানক সঙ্কটের মুখে পড়বে।

গাজার শেষ দিনগুলো

ক্রিস হেজেস রচিত

এটাই শেষ। গণহত্যার চূড়ান্ত রক্তমাখা অধ্যায়। শীঘ্রই এটি শেষ হবে। আর কয়েক সপ্তাহ। বড়জোর। দুই মিলিয়ন মানুষ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বা খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। ইসরায়েলি শেল, ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন, বোমা এবং গুলির আঘাতে প্রতিদিন ডজন ডজন

মানুষ নিহত ও আহত হচ্ছে। তাদের বিশুদ্ধ জল , ঔষধ এবং খাদ্যের অভাব। তারা ভেঙে পড়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে। অসুস্থ। আহত। আতঙ্কিত। অপমানিত। পরিত্যক্ত। নিঃস্ব। ক্ষুধার্ত। আশাহীন।

এই ভয়াবহ গল্পের শেষ পাতায়, ইসরায়েল নিষ্ঠুরভাবে ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনিদের খাবারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করছে, তাদেরকে মিশরের সীমান্তবর্তী সংকীর্ণ এবং জনাকীর্ণ নয় মাইল দীর্ঘ ভূমির ফালিতে টেনে আনছে। ইসরায়েল এবং তাদের Cynically (ব্যঙ্গাত্মকভাবে) নাম দেওয়া গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (GHF), যা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মোসাদ দ্বারা অর্থায়িত বলে অভিযোগ, starvation-কে (অনাহার) অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণ গাজায় আকৃষ্ট করছে, ঠিক যেভাবে নাৎসিরা ওয়ারশ ঘেটোর ক্ষুধার্ত ইহুদিদের ডেথ ক্যাম্পে ট্রেনে উঠতে প্রলুব্ধ করেছিল। লক্ষ্য ফিলিস্তিনিদের খাওয়ানো নয়। কেউ গুরুত্ব সহকারে যুক্তি দেয় না যে পর্যাপ্ত খাবার বা সাহায্য কেন্দ্র আছে। লক্ষ্য হলো ফিলিস্তিনিদের কড়া পাহারায় থাকা কম্পাউন্ডে ঠাসা এবং তাদের নির্বাসিত করা।

এরপর কী আসবে? আমি অনেক আগেই ভবিষ্যৎ অনুমান করা ছেড়ে দিয়েছি। ভাগ্য আমাদের চমকে দিতে জানে। তবে গাজার এই মানব বধ্যভূমিতে একটি চূড়ান্ত মানবিক বিস্ফোরণ ঘটবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফিলিস্তিনিদের ক্রমবর্ধমান ভিড় একটি খাদ্য পার্সেল পাওয়ার জন্য লড়াই করছে, যার ফলে সাহায্য বিতরণের প্রথম আট দিনে ইসরায়েলি এবং মার্কিন বেসরকারি ঠিকাদারদের গুলিতে অন্তত ১৩০ জন নিহত এবং সাত শতাধিক আহত হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গাজায় আইএসআইএস-এর সাথে যুক্ত গ্যাংগুলোকে অস্ত্র দিচ্ছে, যারা খাদ্য সরবরাহ লুট করছে। ইসরায়েল, যারা ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থা (UNRWA)-এর শত শত কর্মচারী, ডাক্তার, সাংবাদিক, সরকারি কর্মচারী এবং পুলিশকে লক্ষ্যবস্তু করে হত্যা করেছে, তারা সুশীল সমাজের পতন ঘটিয়েছে।

আমার সন্দেহ হয়, ইসরায়েল মিশরীয় সীমান্তে বেড়া ভাঙতে সাহায্য করবে। মরিয়া ফিলিস্তিনিরা মিশরীয় সিনাইয়ে দলে দলে ঢুকে পড়বে। হয়তো অন্য কোনোভাবে এর শেষ হবে। তবে শীঘ্রই এর অবসান হবে। ফিলিস্তিনিরা আর বেশি কিছু সহ্য করতে পারবে না।

আমরা;এই গণহত্যার পূর্ণ অংশগ্রহণকারীরা;গাজাকে খালি করে বৃহত্তর ইসরায়েল সম্প্রসারণের আমাদের উন্মাদ লক্ষ্য অর্জন করব। আমরা সরাসরি সম্প্রচারিত গণহত্যার উপর পর্দা টানব। আমরা হলোকাস্ট অধ্যয়নের সর্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামগুলোকে উপহাস করব, যা, দেখা যাচ্ছে, গণহত্যা বন্ধ করার জন্য আমাদের প্রস্তুত করার জন্য নয়, বরং ইসরায়েলকে একটি চিরন্তন শিকার হিসাবে মহিমান্বিত করার জন্য তৈরি, যাকে ব্যাপক হত্যা চালানোর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। 'আর কখনো নয়' এই মন্ত্রটি একটি রসিকতা। যখন আমাদের গণহত্যা বন্ধ করার ক্ষমতা থাকে এবং আমরা তা করি না, তখন আমরা দায়ী;এই ধারণা আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গণহত্যা হলো জননীতি। আমাদের দুটি শাসক দল দ্বারা সমর্থিত এবং টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

আর কিছু বলার নেই। হয়তো এটাই আসল উদ্দেশ্য। আমাদের বাক্যহারা করে দেওয়া। কে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অনুভব করে না? এবং হয়তো, সেটাও উদ্দেশ্য। আমাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেওয়া। কে traumatized (মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত) নয়? এবং হয়তো সেটাও পরিকল্পিত ছিল। আমাদের কোনো কিছুই, মনে হয়, হত্যা বন্ধ করতে পারে না। আমরা অসহায় বোধ করি। আমরা powerless (শক্তিহীন) বোধ করি। গণহত্যা একটি spectacle (spectacle)।

আমি আর ছবিগুলো দেখি না। সারি সারি ছোট কাপড়ে মোড়া দেহ। শিরশ্ছেদ করা পুরুষ ও মহিলা। তাঁবুতে জীবন্ত দগ্ধ পরিবার। হাত-পা হারানো বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশুরা। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে টেনে বের করা মৃতদের চকের মতো মুখ। কান্নার রোল। শীর্ণ মুখ। আমি পারি না।

এই গণহত্যা আমাদের তাড়া করবে। এটি সুনামির মতো শক্তি নিয়ে ইতিহাসের নিচে প্রতিধ্বনিত হবে। এটি আমাদের চিরতরে বিভক্ত করবে। আর ফিরে যাওয়ার পথ নেই।

এবং আমরা কিভাবে স্মরণ করব? স্মরণ না করে।

একবার এটি শেষ হয়ে গেলে, যারা এর সমর্থন করেছিল, যারা এটিকে উপেক্ষা করেছিল, যারা কিছুই করেনি, তারা ইতিহাসকে নতুন করে লিখবে, তাদের ব্যক্তিগত ইতিহাস সহ।

যুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানিতে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল যে নাৎসি হওয়ার কথা স্বীকার করেছিল, অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে বিভাজন শেষ হওয়ার পর কু ক্লুক্স ক্ল্যানের সদস্য হওয়ার কথা স্বীকার করেছিল। নিরপরাধ জাতি। এমনকি শিকারও। একই রকম হবে। আমরা ভাবতে ভালোবাসি যে আমরা অ্যান ফ্রাঙ্ককে বাঁচাতাম। সত্যটা ভিন্ন। সত্য হলো, ভয়ে পঙ্গু হয়ে, প্রায় আমরা সবাই কেবল নিজেদের বাঁচাবো, এমনকি অন্যদের বিনিময়েও। কিন্তু এটা এমন একটি সত্য যা মেনে নেওয়া কঠিন। এটাই হলোকাস্টের আসল শিক্ষা। বরং এটি মুছে ফেলাই ভালো।

তার বই 'ওয়ান ডে, এভরিওয়ান উইল হ্যাভ অলওয়েজ বিন অ্যাগেইনস্ট দিস'-এ ওমর এল আক্কাদ লিখেছেন

'যদি একটি ড্রোন গ্রহের অন্য প্রান্তে কোনো নামহীন আত্মাকে

বাষ্পীভূত করে দেয়, আমাদের মধ্যে কে হৈচৈ করতে চায়? যদি দেখা যায় তারা সন্ত্রাসী ছিল? যদি ডিফল্ট অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়, এবং আমরা প্রচ্ছন্নভাবে সন্ত্রাসী সহানুভূতিশীল হিসাবে চিহ্নিত হই, সমাজচ্যুত হই, তিরস্কৃত হই? সাধারণত দেখা যায় যে, লোকেরা তাদের সাথে ঘটতে পারে এমন সবচেয়ে খারাপ সম্ভাব্য ঘটনা দ্বারা সবচেয়ে বেশি উৎসাহের সাথে অনুপ্রাণিত হয়। কারো কারো জন্য, সবচেয়ে খারাপ সম্ভাব্য ঘটনা হতে পারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তাদের বংশের অবসান। তাদের পুরো জীবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া এবং এটি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে পূর্বেই ন্যায্য বলে প্রমাণিত হওয়া, যারা নিহত হওয়ার কারণে ডিফল্টরূপে সন্ত্রাসী। অন্যদের জন্য, সবচেয়ে খারাপ সম্ভাব্য ঘটনা হলো তিরস্কারিত হওয়া।'

আপনি একটি জাতিকে ধ্বংস করতে পারবেন না, ২০ মাস ধরে তাদের বাড়িঘর, গ্রাম এবং শহর নিশ্চিহ্ন করার জন্য ব্যাপক বোমা হামলা চালাতে পারবেন না, হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে গণহত্যা করতে পারবেন না, ব্যাপক অনাহার নিশ্চিত করার জন্য অবরোধ তৈরি করতে পারবেন না, যে জমিতে তারা শত শত বছর ধরে বাস করেছে সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারবেন না এবং blowback (প্রতিক্রিয়া) আশা করবেন না। গণহত্যা শেষ হবে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শাসনের প্রতিক্রিয়া শুরু হবে। যদি আপনি মনে করেন তা হবে না, তবে আপনি মানব প্রকৃতি বা ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ওয়াশিংটনে দুই ইসরায়েলি কূটনীতিকের হত্যা এবং কলোরাডোর বোল্ডারে একটি প্রতিবাদে ইসরায়েলের সমর্থকদের উপর হামলা কেবল শুরু।

চায়ম এঙ্গেল, যিনি পোল্যান্ডের নাৎসি সোবিবোর ডেথ ক্যাম্পে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন, বর্ণনা করেছেন কীভাবে তিনি একটি ছুরি হাতে ক্যাম্পের একজন প্রহরীকে আক্রমণ করেছিলেন।

'এটা কোনো সিদ্ধান্ত নয়,' বছরের পর বছর পর এঙ্গেল ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'আপনি কেবল প্রতিক্রিয়া দেখান, সহজাতভাবে আপনি সেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান, এবং আমি ভেবেছিলাম, 'চলো এটা করি, এবং যাই আর করি।' আর আমি গিয়েছিলাম। আমি লোকটির সাথে অফিসে গিয়েছিলাম এবং আমরা এই জার্মানকে হত্যা করেছিলাম। প্রতিটি আঘাতে, আমি বলেছিলাম, 'এটা আমার বাবার জন্য, আমার মায়ের জন্য, এই সমস্ত মানুষের জন্য, তোমরা যে সমস্ত ইহুদিদের হত্যা করেছো তাদের জন্য।'

কেউ কি ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে ভিন্নভাবে কাজ করার আশা করে? সভ্যতা অগ্রদূত হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করা ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন এমন একটি গণহত্যাকে সমর্থন করে, যা তাদের বাবা-মা, তাদের সন্তান, তাদের সম্প্রদায়কে হত্যা করেছে, তাদের ভূমি দখল করেছে এবং তাদের শহর ও বাড়িঘরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, তখন তারা কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে? যারা তাদের প্রতি এই কাজ করেছে, তাদের প্রতি তারা ঘৃণা না করে কিভাবে পারবে?

এই গণহত্যা শুধু ফিলিস্তিনিদের নয়, গ্লোবাল সাউথের সকলকেই কী বার্তা দিয়েছে?

এটি unequivocal (দ্ব্যর্থহীন)। আপনি গুরুত্বপূর্ণ নন। মানবিক আইন আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমরা আপনার কষ্ট, আপনার সন্তানদের হত্যা নিয়ে পরোয়া করি না। আপনি কীট। আপনি মূল্যহীন। আপনি নিহত, ক্ষুধার্ত এবং বিতাড়িত হওয়ার যোগ্য। আপনাকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা উচিত।

'সভ্য বিশ্বের মূল্যবোধ রক্ষা করতে হলে একটি গ্রন্থাগারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন,' এল আক্কাদ লিখেছেন 'একটি মসজিদ উড়িয়ে দেওয়া। জলপাই গাছ পুড়িয়ে দেওয়া। পালিয়ে যাওয়া মহিলাদের অন্তর্বাস পরে ছবি তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া। গহনা, শিল্পকর্ম, খাবার লুট করা। ব্যাংক। শাকসবজি তোলার জন্য শিশুদের গ্রেপ্তার করা। পাথর ছোঁড়ার জন্য শিশুদের গুলি করা। বন্দীদের অন্তর্বাসে জনসমক্ষে আনা। একজন মানুষের দাঁত ভেঙে তার মুখে টয়লেট ব্রাশ ঢুকিয়ে দেওয়া। ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত একজন মানুষের উপর যুদ্ধের কুকুর লেলিয়ে দেওয়া এবং তারপর তাকে মরতে দেওয়া। অন্যথায়, অসভ্য বিশ্ব জিতে যেতে পারে।'

আমি বছরের পর বছর ধরে যাদের চিনি, তাদের সাথে আর কখনো কথা বলব না। তারা জানে কী ঘটছে। কে না জানে? তারা তাদের সহকর্মীদের alienated (বিচ্ছিন্ন) করার, antisemite (ইহুদি-বিদ্বেষী) হিসাবে কলঙ্কিত হওয়ার, তাদের status (অবস্থা) jeopardized (বিপদাপন্ন) করার, তিরস্কারিত হওয়ার বা চাকরি হারানোর ঝুঁকি নেবে না। তারা মৃত্যুর ঝুঁকি নেয় না, যেভাবে ফিলিস্তিনিরা নেয়। তারা তাদের pathetic (করুণ) অবস্থা এবং সম্পদের স্মৃতিসৌধকে কলঙ্কিত করার ঝুঁকি নেয়, যা তারা তাদের জীবন দিয়ে তৈরি করেছে। idols (প্রতিমা)। তারা এই প্রতিমাদের সামনে নত হয়। তারা এই প্রতিমাদের পূজা করে। তারা তাদের দ্বারা enslaved (দাসত্ব) বরণ করে।

এই প্রতিমাদের পায়ের নিচে শুয়ে আছে হাজার হাজার নিহত ফিলিস্তিনি।

(ক্রিস লিন হেজেস একজন পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিক, বেস্ট সেলিং লেখক এবং কর্মী।)

ভারতের কণ্ঠস্বর শোনানোর জন্য এখনও খুব বেশি দেরি হয়নি

সোনিয়া গান্ধি

গাজার ধ্বংসযজ্ঞ এবং ইরানের বিরুদ্ধে শত্রুতা সম্পর্কে নয়াদিল্লির নীরবতা দেশের নৈতিক ও কূটনৈতিক ঐতিহ্য থেকে অস্বস্তিকর বিচ্যুতি।

১৩ জুন, ২০২৫ তারিখে, বিশ্ব আবারও একতরফা সামরিকবাদের বিপজ্জনক পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছে, যখন ইসরায়েল ইরান এবং তার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গভীরভাবে উদ্বেগজনক বেআইনি হামলা শুরু করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইরানের মাটিতে এই বোমা হামলা এবং (লক্ষ্য স্থির করে) হত্যার নিন্দা জানিয়েছে, যা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিকভাবে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। গাজায় ইসরায়েলের সাম্প্রতিক অনেক কর্মকাণ্ডের মতো, বেসামরিক জীবন এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রকাশ করে এই অভিযান চালানো হয়েছে। এই কর্মকাণ্ডগুলি কেবল অস্থিতিশীলতাকে আরও গভীর করবে এবং সংঘাতের বীজ বপন করবে।

ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যখন প্রতিশ্রুতির লক্ষণ দেখাচ্ছিল, তখন এই ধরনের আক্রমণ হওয়া আরও দুঃখজনক। এই বছর ইতিমধ্যেই পাঁচ দফা আলোচনা হয়েছে, ষষ্ঠ দফা জুনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এবং, অতি সম্প্রতি ২০২৫ সালের মার্চ মাসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা ডাইরেক্টর তুলসি গ্যাবার্ড কংগ্রেসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি অনুসরণ করছে না এবং ২০০৩ সালে স্থগিতের পর থেকে এর পুনঃসূচনা অনুমোদন করেননি এর সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে বর্তমান ইসরায়েলি নেতৃত্বের শান্তি বিনষ্ট এবং চরমপন্থাকে লালন করার দীর্ঘ এবং দুর্ভাগ্যজনক রেকর্ড রয়েছে। তাঁর সরকারের অবৈধ দখলদারির ধারাবাহিক বৃদ্ধি, অতি-জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর সাথে জোট এবং দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানে বাধা কেবল ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশাকেই আরও গভীর করেনি বরং (এই) বৃহত্তর অঞ্চলকে চিরস্থায়ী সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মিঃ নেতানিয়াহু ঘৃণার আগুনকে আরও জ্বালিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন যা ১৯৯৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ইতজাক রবিনের হত্যায় চূড়ান্ত রূপ পায়, যার ফলে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক শান্তি উদ্যোগগুলির একটির অবসান ঘটে।

এই রেকর্ডের পরিপ্রেক্ষিতে, এটা অবাক করার মতো কিছু নয় যে মি. নেতানিয়াহু সংহতির পরিবর্তে উত্তেজনা বৃদ্ধিকেই বেছে নেবেন। গভীরভাবে দুঃখজনক বিষয় হল যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প - যিনি একসময় আমেরিকার অন্তহীন যুদ্ধ এবং সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সের প্রভাবের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন - এখন তিনি এই ধ্বংসাত্মক পথ অনুসরণ করতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে। তিনি নিজেই বারবার উল্লেখ করেছিলেন যে ইরাকের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার বিষয়ে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা দাবি কীভাবে একটি ব্যয়বহুল যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করেছিল যা এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল এবং ইরাকে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনে।

অতএব, ১৭ জুন মিঃ ট্রাম্পের বিবৃতি, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর নিজের গোয়েন্দা প্রধানেরই বক্তব্য খারিজ করে দিয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের ক্ষ্মখুব কাছাকাছিক্ষ্ম আছে, তা গভীর হতাশাজনক। বিশ্বের কাছে এমন নেতৃত্ব প্রত্যাশিত এবং প্রয়োজনীয় যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং কূটনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, বলপ্রয়োগ বা মিথ্যাচারের দ্বারা নয়।

দ্বিচারিতার কোনও স্থান নেই

এই অঞ্চলের সম্পূর্ণ ইতিহাস বিবেচনা করে, পারমাণবিক অস্ত্রধারী ইরান সম্পর্কে ইসরায়েলের নিরাপত্তা উদ্বেগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে, দ্বৈত মানদণ্ডের কোনও স্থান থাকতে পারে না। ইসরায়েল নিজেই একটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র যার প্রতিবেশীদের উপর সামরিক আগ্রাসন চালানোর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিপরীতে, ইরান এখনও পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী এবং ২০১৫ সালের যৌথ ব্যাপক কর্মপরিকল্পনার অধীনে, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিনিময়ে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের উপর নির্ধারিত কঠোর সীমা মেনে চলতে সম্মত হয়েছিল। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য, জার্মানি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমর্থিত এই চুক্তিটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছিল, যতক্ষণ না ২০১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে এটি পরিত্যাগ করে। এই সিদ্ধান্ত বছরের পর বছর ধরে চলা কঠোর কূটনীতিকে ব্যর্থ করে দেয় এবং আবারও এই অঞ্চলের ভঙ্গুর স্থিতিশীলতার উপর দীর্ঘ ছায়া ফেলে।

ভারতও সেই ভাঙনের পরিণতি বহন করেছে। ইরানের উপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ক্ষমতা মারাত্মকভাবে সীমিত

হয়ে পড়ে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহন করিডোর এবং চাবাহার বন্দরের উন্নয়ন-এই উদ্যোগগুলি মধ্য এশিয়ার সাথে আরও গভীর সংযোগ এবং আফগানিস্তানে আরও সরাসরি প্রবেশাধিকারের প্রতিশ্রুতি বহন করে।

ইরান ভারতের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধু এবং গভীর সভ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ। জম্মু ও কাশ্মীর সহ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এর অবিচল সমর্থনের ইতিহাস রয়েছে। ১৯৯৪ সালে, ইরান কাশ্মীর ইস্যুতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে ভারতকে নিয়ে সমালোচনামূলক একটি প্রস্তাব আটকাতে সাহায্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, (বর্তমানের) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান তার পূর্বসূরী, ইরানের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতের সাথে অনেক বেশি সহযোগিতাপূর্ণ; সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকেছিল।

এদিকে, ভারত এবং ইসরায়েলও সাম্প্রতিক দশকগুলিতে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এই অনন্য অবস্থান আমাদের দেশকে উত্তেজনা হ্রাস এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেতু হিসেবে কাজ করার জন্য নৈতিক দায়িত্ব এবং কূটনৈতিক শক্তি প্রদান করে। এটি কেবল একটি সংক্ষিপ্ত নীতি নয়। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক পশ্চিম এশিয়া জুড়ে বসবাস এবং কাজ করছেন, যা এই অঞ্চলে শান্তিকে জাতীয় স্বার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করে তোলে।

(দ্য হিন্দু, ২১ জুন, ২০২৫ প্রকাশিত অনুবাদ-- শুভাশিস মজুমদার)

নিউইউর্কে মেয়র পদের জন্য মামদানির উত্থানে ভীত হয়ে পড়েছেন মহামতি ট্রাম্প

মনিরুল হক

গত কয়েকদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে এমন একটা কান্ড ঘটেছে যা সাধারণ ও স্বাভাবিক বললে ভুল হয় না, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই মনে করছেন ঘটনাটা অসামান্য এবং এর ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

নিউইয়র্ক শহরের মেয়র পদে নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়েছে আগামী নভেম্বর মাসের ৪ তারিখ। তার আগে ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী কে হবেন তা নির্ধারণ করা হল গত ২৪ জুন তারিখে। এই প্রার্থী নির্ধারক ভোটে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় প্রার্থী ছিলেন অ্যান্ড্রু কুয়োমা, যিনি ইতালি-আমেরিকান পরিবারের সন্তান এবং প্রবীন ডেমোক্র্যাট রাজনীতিবিদ। তাঁর বাবা ছিলেন নিউইয়র্ক রাজ্যের দীর্ঘদিনের গভর্ণর এবং তিনি নিজেও এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওই একই পদে ছিলেন। বিল ক্লিন্টন থেকে শুরু করে ডেমোক্র্যাট দলের বহু হোমরা-চোমরা নেতারা সর্বদা তাঁর পক্ষে থাকেন। তবে এক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হয়ে তিনি গভর্ণর পদ ছাড়তে বাধ্য হন এবং এইবার শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়ে রাজনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তিনি এবং তাঁর সব ওজনদার সমর্থকরা বুঝতেও পারেন নি যে তিনি গো-হারা হারবেন জোরহান মামদানির কাছে, যিনি আমেরিকার নাগরিকত্বই পেয়েছেন এই ২০১৮ সালে। দলীয় নির্বাচনে মামদানি পেয়েছেন ৪৩.৫% ভোট আর কুয়োমা পেয়েছেন ৩৬.৪% ভোট। এভাবেই জোরহান মামদানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর নিউইয়র্কের মেয়র হওয়ার পথে একধাপ এগিয়ে গেলেন।

অনেকেই ভেবে অবাক হচ্ছেন, কীভাবে মামদানি এমন জনসমর্থন লাভ করলেন। আসলে নিউইয়র্ক শহর; শুধু নিউইয়র্ক কেন, গোটা আমেরিকাতেই ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে গেছে। সারা দেশে গরীব মানুষ অত্যন্ত অসহায় ভাবে দিন কাটাচ্ছেন। একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান দিলেই ব্যাপারটা পরিস্কার হবে। গোটা দেশে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন প্রায় ১৪% মানুষ আর নিউইয়র্ক শহরে এই হার ২৫%। মামদানি গরীব মানুষের এই অসহায়ত্ব অনুধাবন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন এবং তাঁদের স্বার্থে কাজ করবেন বলেই অঙ্গীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, নির্বাচিত হলে তিনি

১) ধনীদের উপর বেশি হারে কর আরোপ করবেন। যেমন আয়কর ২% বাড়াবেন, কর্পোরেট ট্যাক্স ৭.২৫% থেকে বাড়িয়ে ১১.৫% করবেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেছেন, নিউ জার্সিতে এই হারেই কর নেওয়া হয়। করের এই বাড়তি টাকা তিনি গরীব মানুষের জন্য ব্যয় করবেন।

২) যাঁদের আয় কম তাঁদের পক্ষে শহরে থাকার জায়গা পাওয়া দুষ্কর সাধ্য। বাড়ি ভাড়া অত্যন্ত বেশি। তাই তিনি বাড়ি ভাড়া স্থিতিশীল করবেন, ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত করবেন। বাসস্থান সম্যস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ২০০০০০ ইউনিট সাধ্যমূল্যের বাড়ি তৈরি করার কথাও তিনি বলেছেন।

৩) নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম গত এক দশকে দেড় গুণ বেড়েছে। শহরের ৫টি বরো (Borough) এলাকায় ৫টি বড় মুদি দোকান স্থাপন করবেন যেখানে কম দামে/ন্যায্য দামে মানুষ কেনাকাটা করতে পারবেন।

৪) শহরে পরিবহন ব্যয় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। তিনি বিনা ভাড়ায় শহরে বাস চালানোর কথা ঘোষণা করেছেন।

৫) শহরে বাস করে বাচ্চা মানুষ করা মধ্যবিত্তদের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাচ্চা জন্মালে অনেকেই শহর ত্যাগ করে দূরে চলে যাচ্ছেন। তিনি একটা বয়স পর্যন্ত বিনামূল্যে ক্রেশে বাচ্চা রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৬) বর্তমানে সাধারণ মানুষের গড় আয় ঘন্টায় ১৬.৫ ডলার। তিনি ২০৩০ সালের মধ্যে এই গড় আয় ৩০ ডলারে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য লস এঞ্জেলস- ট্যুরিজম ক্ষেত্রে এটাই দৈনিক মজুরির হার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোট পরিচালনার খরচও খুব বেশি। মামদানির সঞ্চয় ও আয়ের পরিমাণ তেমন কিছু নয়। তাই সাধারণ মানুষের কাছে থেকে দান গ্রহণ করেই তিনি নির্বাচনী প্রচার সম্পন্ন করেছেন।

বয়স তাঁর মাত্র ৩৩ বছর। কিন্তু জোরহান মামদানি রাজনীতিতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। ২০২০ সালেই তিনি নিউইয়র্ক রাজ্য অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন। এরপর ২০২২ ও ২০২৪ সালেও তিনি পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। এই মুহূর্তেও তিনি অ্যাসেম্বলির একজন নির্বাচিত সদস্য এবং এই লম্বা সময়কালে তিনি বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের সদস্য হিসাবে যথেষ্ট যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে যা সামনে এসেছে তা হল বর্ণবাদ, আধিপত্যবাদ এবং আগ্রাসনবাদের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান ও স্পষ্ট উচ্চারণ। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন তিনি যেমন নিউইয়র্ক শহরের সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর সহমর্মীতা প্রকাশ করেছেন তেমনি সারা পৃথিবীর অত্যাচারীত মানুষের প্রতিও তাঁর সমর্থন ঘোষনা করেছেন। সাধারণ মুসলিম, খ্রীষ্টান ও ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষের সমর্থনে থাকার অঙ্গীকার যেমন তিনি করেছেন তেমনি হামাসের ইজরায়েল অভিযানের নিন্দা করেছেন, গাজায় নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য ইজরায়েলকে খুনি তকমা দিয়েছেন। বলেছেন তিনি মেয়র হওয়ার পরে নেতানিয়াহু যদি নিউইয়র্কে আসেন তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করবেন কারণ ঐ ভদ্রলোক আন্তর্জাতিক আদালত কতৃক ঘোষিত যুদ্ধাপরাধী। বলেছেন গণহত্যাকারী নরেন্দ্র মোদী যদি নিউইয়র্কে আসেন তবে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না।

একদিকে দেশের মধ্যে সম্বলহীন, গৃহহীন, খেটে খাওয়া গরীব, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের দাবীদাওয়া নিয়ে সোচ্চার হওয়া এবং অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা তার প্রধান ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে পুঁজির আগ্রাসন, ইজরায়েল রাষ্ট্র তথা তার প্রধান নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে চলমান বর্ণবৈষম্য ও ধর্মীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া অবস্থান নেওয়ায় মামদানিকে নিয়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে সারা বিশ্বে। তাঁর প্রাথমিক জয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্টের মিলিওনার-বিলিওনাররা এবং রাজনৈতিক দলগুলিতে থাকা তাঁদের প্রতিভূরা। নিউইয়র্কের বর্তমান মেয়র, তাঁর দলেরই কালো মানুষ, একদা পুলিশ অফিসার এরিখ অ্যাডামস তো বলেই বসেছেন, মামদানি হল -"Snake Oil Seller". শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই নভেম্বরের ভোটে অংশ নেওয়ার কথাও ঘোষনা করেছেন। নিউইয়র্কের গভর্ণর, তাঁর দলেরই ক্যাথি হচুল নতুন করে ট্যাক্স বৃদ্ধির বিরোধিতা করেছেন।

এদিকে হতাশ হয়ে পড়ছেন মহা মহা ব্যবসায়ীরা। 'Gristendes Grocery Chain' এর বিলিওনার মালিক John Catsimatidis আতঙ্কিত হয়ে ঘোষনা করেছেন, মামদানি জিতলে তিনি নিউইয়র্কের সব 'মল' বন্ধ করে দেবেন। একজন ধনকুবের Phillippe Laffont বলেছেন, "Mamdani win could trigger another exodus of wealthy investors". অত্যন্ত প্রভাবশলী Bill Ackman বলেছেন, সবার সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা কোনো যোগ্য প্রার্থী বেছে নেবেন মামদানিকে পরাজিত করার জন্য এজন্য তাঁরা 'Hundreds of Millions of Dollars' ব্যয় করতেও পিছপা হবেন না। একাধিক মার্কিন সিনেটর মামদানির নাগরিকত্ব বাতিল করে তাঁর পিতৃভূমি উগান্ডায় পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। মামদানি ধর্মে শিয়া মুসলিম। তাই তাঁর এই জয়ে সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শুরু হয়েছে ইসলামোফোবিয়া। মান্যগন্য সিনেটর, অর্থনীথিবিদ, সোসাল অ্যাক্টিভিস্ট যিনি যে ভাষায় পারছেন আক্রমণ করে যাচ্ছেন মামদানিকে। আর এই সবের কথাবার্তায় উৎসহিত হয়ে মহামতি ট্রাম্প মামদানির প্রতি ঘৃণাভরে যে অমৃত উদগীরণ করেছেন তা তো বাঁধিয়ে রাখার মত-"100 Percent Communist Lunatic". তিনি ভয় পেয়ে ভয় দেখিয়ে বলেছেন, মামদানি মেয়র নির্বাচিত হলে তিনি সমস্ত অনুদান বন্ধ করে দেবেন।

আর স্বয়ং জোরহান মামদানি নিজের সম্পর্কে কী বলেছেন তা এবার একটু দেখা যাক। তিনি বলেছেন, - I call myself a democratic socislist in many way inspired by the words of DR. KING from decades ago– who said– "CALL IT DEMOCRACY OR DEMOCRATIC SOCISLISM– THERE HAD TO BE A BETTER DISTRIBUTION OF WEALTH FOR ALL OF GODS CHILDREN IN THIS COUNTRY".

কিন্তু মার্টিন লুথার কিং- এর কথা শোনার মতো অবস্থায় নেই জনগণের শত্রুরা। তাই মামদানির সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন ও সুবিশাল লড়াইয়ের ক্ষেত্র। আমরা জানি তিনি লড়বেন, লড়ে যাবেন। তাঁর বাবা তাঁর নাম রেখেছিলেন Zorhan Kwame Mamdan. 'Kwame' হল ঘানার স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা 'Kawme Nakrumaé- র নামের প্রথম অংশ। চিন্তা ও চেতনায় আধুনিক প্রগতিশীল বাবা-মা মাহমুদ মামদানি আর মীরা নায়ারের সন্তান জোরহান কাওমে মামদানি আত্মপ্রকাশই করেছেন পুঁজিবাদের কারাগার নিউইয়র্ক থেকে। তাঁকে দমাবে কে?

সেন্সাস দেরি হলে কি ক্ষতি, কেনই বা দেরি ?

অশোক সরকার

অবশেষে সেন্সাস হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তার সঙ্গে নাকি জাতি গণনাও হবে। সেন্সাস করতে কেন এত দেরি হল তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। কোভিড মহামারির কারণে ২০২১-এ নির্দিষ্ট সময়ে করা সম্ভব ছিল না একথা ঠিক, তবে তারপর ৬ বছর ধরে কেন করা হল না তার কোন ব্যাখ্যা নেই। ১৪৩টা দেশ কোভিডের পরে সেন্সাস করতে পেরেছে, আমরা পারলাম না কেন ?

সেন্সাসটা সত্যিই কি তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ধন্দ আছে। অনেককেই বলতে শুনেছি সেন্সাস মানে জনগণনা। আসলে সেন্সাসের দুটি অংশ, একটিকে বলা হয় ডেমগ্রাফিক, তার মধ্যে জনগণনা, পুরুষ নারী, শিশু বৃদ্ধ, তপশিলী জাতি জনজাতি, শিক্ষা, পেশা, পরিযান ইত্যাদি মাপা হয়। প্রতিটি গ্রাম ও শহরের প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির তথ্য নেওয়া হয়। সেন্সাস সংক্রান্ত আলোচনায় এই অংশটিই বেশি করে উঠে আসে। এই অংশ থেকেই বোঝা যায় ভারতে পুরুষ নারীর অনুপাত কি রকম, মানুষ কত বছর বাঁচছে, কত মানুষ স্কুল কলেজ পেরিয়েছে, বোঝা যায় কত মানুষ কৃষি, পরিষেবা বা অন্য কোন পেশায় যুক্ত, নগরায়ন কতটা এগোল ইত্যাদি।

সেন্সাসের দ্বিতীয় অংশটির নাম amenities, যেখানে মাপা হয়, কত বাড়িতে পাইপের জল আছে, টয়লেট আছে, বিদ্যুৎ আছে, প্রতিটি গ্রামে কতটা পাকা রাস্তা আছে, স্কুল কত দূরে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল কত দূরে, জানা যায় পাকা বাড়ি কাঁচা বাড়ির সংখ্যা, কটা বাড়িতে ফোন আছে, আরও অনেক কিছু। এই তথ্যও প্রতি গ্রাম ও টাউন;শহর থেকে পাওয়া যায়।

এত তথ্য নেবার দরকারটা কি? দরকার এই জন্য যে সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারণ করতে গেলে, তার পিছনে তথ্য লাগে। যদি বলি ৫০০-র বেশি মানুষ থাকেন এমন গ্রামগুলির দোরগোড়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা করে দেওয়া হবে। তাহলে জানতে তো হবে যে এমন কত গ্রাম আছে যেখানে পাকা রাস্তা নেই। যদি বলি সব বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে, তাহলে জানতে হয় কত বাড়িতে এখন বিদ্যুৎ নেই। তার পরে জানতে হয় কোন রাজ্যে তা যথেষ্ট বেশি , কোন রাজ্যে অত বেশি নয়, সেই অনুযায়ী বাজেটে বরাদ্দ করতে হবে। একই কথা ওঠে জনকল্যাণ কর্মসূচি নিয়ে এবং অধিকার কেন্দ্রিক কর্মসূচিগুলি নিয়ে। ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ কোন রাজ্য কত পাবে, তা নির্ভর করে রাজ্যগুলির গ্রামীণ জনসংখ্যা কত, ভূমিহীন শ্রমিক কত, তার উপরে এবং তারপরে দেখতে হয় গত কয়েক বছরে কত দিন কাজ দেওয়া গেছে। খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী গ্রামে ৭৫ ভাগ আর শহরে ৫০ ভাগ মানুষকে রেশন দিতে গেলে জানতে হয়, গ্রামে ও শহরে জনসংখ্যা কত, তবে তার ৭৫ আর ৫০ ভাগ বের করা যায়। এছাড়া যত নমুনা সমীক্ষা হয়ে থাকে, সেখানে নমুনাগুলি চয়ন করতে গেলে মোট কত আছে তা জানতে হয়। ধরা যাক নগরায়নের নমুনা সমীক্ষা হবে, যেখানে ছোট, মাঝারি, বড়, খুব বড় শহরগুলি থেকে নমুনা নিয়ে সেই শহরগুলির পরিকাঠামো বিশ্লেষণ করা হবে। নমুনা চয়ন করতে গেলে জানতে হয় এই চার রকমের শহর কতগুলি আছে, কোন রাজ্যে কত আছে, কোন অঞ্চলে কত আছে ইত্যাদি। তবে তার থেকে নমুনা চয়ন করা যায়।

সেন্সাস দেশের সরকারের গবেষক সমাজকর্মীদের কাছে একটা অতি আবশ্যক আতসকাঁচের মত, যা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও তার গতি প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে। সেন্সাস ঠিক সময়ে না হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেশন পাবার যোগ্য প্রায় ১০ কোটি মানুষ। যে ৮১ কোটি মানুষকে রেশন দেওয়া হয়, সেই সংখ্যাটি ২০১১-র সেন্সাসের ভিত্তিতে নির্ধারিত। ২০১৩ থেকে এঁরা রেশন পাচ্ছেন, কিন্তু ২০১৩ র পরে জন্ম যাদের তারা পাচ্ছে না। নগরায়ন কতটা এগোল জানা যাচ্ছে না, বিশেষত গত ২০০১ থেকে ২০১১-র মধ্যে যে বিপুল সংখ্যায় সেন্সাস টাউন তৈরি হয়েছিল, সেই গতি বাড়ল না কমল? শুধু পশ্চিমবঙ্গেই তো ওই ১০ বছরে ৭৮০টি সেন্সাস টাউন তৈরি হয়েছিল। কৃষি শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ল না কমল? যারা বছরে ১৮০ দিনের বেশি কাজ পায় তাদের সেন্সাস বলে প্রধান শ্রমিক (main worker)। এদের সংখ্যা কি বাড়ল? বোঝা যাচ্ছে না।

নীতির জগতে সেন্সাসের প্রয়োজন কিছু কম নয়। কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন ও রাজ্য অর্থ কমিশন কেন্দ্র রাজ্য ও পঞ্চায়েত-মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে যে অর্থের বাঁটোয়ারা করে, তার ফরমুলার মধ্যে জনসংখ্যার অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই জনসংখ্যাটি পাওয়া যায় সেন্সাস থেকে। ১৬ তম অর্থ কমিশন ২০২৩ সালে গঠন করা হয়েছে, ২০২৬-এ তার সুপারিশ দেবে। তাদের জনসংখ্যার সঠিক তথ্য ছাড়াই কাজ করতে হবে। আগেকার সেন্সাসে পাওয়া জনসংখ্যার সঙ্গে বৃদ্ধির হার প্রয়োগ করে প্রক্ষিপ্ত জনসংখ্যা দিয়েই তাদের কাজ চালাতে হবে। রাজ্য অর্থ কমিশনগুলিও তাই করছে। এই প্রসঙ্গে জাতি গণনার কথাও ওঠে। অনেক রাজ্যই ওবিসি সংরক্ষণ করেছে। কোন তথ্যের ভিত্তিতে? সেন্সাস ছাড়া কোন রাজ্যে কত ওবিসি আছে, ওবিসিদের মধ্যে কি কি জাতি কত সংখ্যায় আছে কি করে জানা গেল? না জানা যায়নি, ওবিসি সংরক্ষণগুলি হয়েছে কিছুটা আন্দাজে, আর কিছুটা সেই সাচার কমিটি (২০০৮)-র রিপোর্টের ভিত্তিতে। তার উপরে আবার সুপ্রিম কোর্ট একাধিক মামলার রায়ে স্পষ্ট করেছে যে ওবিসিদের মধ্যে ভাগ করতে হবে,

সামাজিকভাবে উপরের দিকে, মাঝামাঝি আর একেবারে নিচের দিকে যারা তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে। সেতো না হয় করা গেল কিন্তু তারা কত সংখ্যায় সেন্সাস ছাড়া জানা যাবে কি করে? কিছু রাজ্য অবশ্য নিজেরা জাতি গণনা করে তা বের করেছে, কিন্তু সারা দেশে সেরকম কোনো কাজ হয় নি।

সেন্সাসের কাজ ২০২৭ এর ফেব্রুয়ারিতে শেষ হবে বলা হয়েছে, কবে শুরু হবে বলা হয় নি। জাতি গণনা হবে বলা হয়েছে, কিন্তু তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। নানা রকম ব্যাখ্যা সম্ভব। এক, ওবিসি জাতিগুলিকে গণনা করা হবে, যাতে জানা যায় কোন ওবিসি জাতি কোন রাজ্যে কত সংখ্যায় আছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা যে ওবিসি জাতিগুলি চিহ্নিত করা হবে না, শুধু ওবিসি চিহ্নিত হবে। তাতে মোট ওবিসি কত জানা যাবে কিন্তু কোন জাতির সংখ্যা কত, তা জানা যাবে না। উচ্চ জাতিগুলিকে গণনা করা হবে কি? আজকের রাজনীতিটা যেহেতু ওবিসিকে ঘিরে তাই সরকার বলতেই পারে, উচ্চ জাতিগুলিকে গণনা করার দরকার নেই। উচ্চ জাতিগুলিকে গণনা না করলে জানা যাবে না যে ডাক্তার উকিল জজ, অধ্যাপক, ব্যাংকিং, ইন্সিউরান্স তথ্য প্রযুক্তি জাতীয় লোভনীয় পেশাগুলিতে কোন জাতির উপস্থিতি কতটা, অর্থাৎ সামাজিক অসাম্য কতটা। সেই দরকারি কাজটি হবে কি? এবার তো সেন্সাস নাকি মোবাইল অ্যাপ দিয়ে হবে, কাজেই সেন্সাসের অ্যাপটি দেখলে তবেই এসব স্পষ্ট হবে।

সেন্সাস কেন হল না সেই কথাতে ফিরে আসি। তিনটে সম্ভাব্য কারণ দেখা যাচ্ছে। এক তো কোভিডের পরেই জনগণনা করলে ভারতের কোভিড মৃত্যুর সংখ্যার সঠিক হিসেবটা জানা যেত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা দাবি করেছিল ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ৪৭ থেকে ৫০ লক্ষের মত, সরকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল। দ্বিতীয়, সেই সময়টায় এন আর সি নিয়ে ভীষণ হইচই হচ্ছিল নানা দিক থেকে রব উঠেছিল যে দেশে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা মারাত্মক বেড়ে গেছে, আর সংখ্যালঘুদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। এই দুই তথ্যই প্রমাণ করতে গেলে সেন্সাস লাগে। সেন্সাস হলে স্পষ্ট বোঝা যেত সত্যিই পরিস্থিতিটা কি, এবং তা যে এই সব দাবির অনুকূলে যেত না সেটা বলাই বাহুল্য। তৃতীয় সম্ভাব্য কারণ হয়ত ভবিষ্যৎমুখি। লোকসভার আসন ২০২৬-এর পরের সেন্সাস পর্যন্ত ৫৪৫-এ বেঁধে রাখা আছে। প্রায় ৫০ বছর ধরে। ২০২৭-এ সেন্সাস করলে তখনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে লোকসভা আসনের পুনর্বিন্যাসের দাবি উঠবে। যেভাবেই তা করা হোক না কেন, দক্ষিণের রাজ্যগুলির তুলনায় উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির আসন বাড়বে। মোট লোকসভা আসন যদি ৫৪৫ ই রাখতে হয়, তাহলে দক্ষিণের রাজ্যগুলির আসন কমবে ২৬টি, উত্তরের রাজ্যগুলির আসন বাড়বে ৩৪টি। আর যদি নতুন করে লোকসভার আসন নির্ধারিত হয় তাহলে মোট আসন হবে ৮৪৮, দক্ষিণের রাজ্যগুলির বাড়বে ৩৫টি, আর শুধু উত্তর প্রদেশ আর বিহার মিলিয়ে বাড়বে ১০৩টি। কারণ গত ৫০ বছরে শিক্ষা ও আর্থিক প্রগতির ফলে দক্ষিণের রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৬-১.৭, সেখানে বিহার উত্তর প্রদেশে ২.৩ থেকে ২.৭। ২০২৯শেই লোকসভা নির্বাচন, কাজেই তার আগে লোকসভা আসনের পুনর্বিন্যাস করতে পারলে, যেহেতু উত্তর ভারতেই বিজেপির প্রাধান্য, সেই প্রাধান্য আরও শক্তপোক্ত ও বিস্তৃত করা সম্ভব হবে। সহজ কথায় উত্তর প্রদেশ বিহার আর তিন চারটে রাজ্য জিততে পারলেই লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্ভব হবে।

এই সুগভীর রাজনৈতিক ছকের প্রয়োজনেই কি আসলে সেন্সাস এত দেরি হল? জাতি গণনা কি পূর্ণমাত্রায় হবে, জাতি গণনা ঠিক সময়ে প্রকাশ হবে? সেন্সাসের পরই কি তাড়াহুড়ো করে Delimitation কমিশন গঠন করে লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস করে দেওয়া হবে ২০২৯-এর মধ্যে? সময়ই এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবে।

(লেখক আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

এলোমলো কথা

কদিন বাদে স্মরণ করা হবে ইরান এক সময়ে ছিলো প্রাচ্যের বা আসার সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র

শুভ বসু

আমার অনেক কাজ আছে। কিন্তু তবুও মুখবইতে দু একটা মন্তব্য না লিখলে শান্তি আসে না। শান্তি মানে নিজের জীবনের শান্তি। পৃথিবীর শান্তি টুম্পি, নেতা নেহি হু অনেক আগেই ভোগে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আসলে ঘটনা হলো প্রেমের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমার কৈশোরে বিরাট দুঃখ ছিল আমার কেউ প্রেমে পড়ে না। ক্যান্টিনে নবদ্বীপে,নন্দসদনে অসীম বা দেবাশীষের বারান্দায় বিরাট দুঃখ নিয়ে বসে থাকতাম। তারপরে কে যেন বুদ্ধি দিলো শোন শুভ উর্দু কবিতা পর। তুই যদি কোনো উর্দু কবিতা মেয়েদের সামনে আওড়াতে পারিস তাহলে তোর প্রেমে পড়বে ?

আমি অধ্যাপক তারিক আলী সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমাকে উনি উর্দু শেখাতে গিয়ে বুঝলেন -আমার দিল কোন দরিয়ায় ভেসে গিয়েছে। উনি আমায় না করে দিলেন।

দিল্লি গেলাম। সেখানে আমি JNU তে উর্দু শ্রেণী পাঠে ভর্তি হলাম। আমাদের পড়াতেন উর্দুভাষার এক গবেষক ছাত্র। দশ দিন মে উর্দু বলে বইটা উনি দিলেন। আমি বইটা পড়লাম। উর্দু বেশ

শিখেছিলাম। দিল্লি ইতিহাসের গভীরে নিমজ্জিত শহর ভারতের রাজনৈতিক প্রাণ কেন্দ্র। আমি বেড়াতে যেতাম মেহেরৌলি, তুঘলকাবাদ, নিজামুদ্দিন আওলিয়া, ফিরোজশাহ কোটলা, লোদী গার্ডেন্স , হুমায়ুন এর মকবরা , লাল কেল্লা আর গলি কাশিমজান , বালিমারান চাঁদনী চকের পাশে। শেষোক্ত জায়গায় কেন যেতাম যাঁরা দিল্লির ইতিহাস বা উর্দু কবিতার ইতিহাস জানেন তাঁরা বলতে পারবেন।

ইতিহাসের যাত্রায় আমার সঙ্গে পরিচয় হতো আমির খুসরৌ, সারমাদ কাশানি , আধুল -কাদির বেদিল বা বেদিল দেহলভী, জেব উন্নেসা , নাজমুদ্দিন শাহ মুবারক অবরো , মির্জা মাজহার জান -এ -জানান , মির্জা গালিব। ভারতীয়দের এঁদের সঙ্গে পরিচয় নেই। থাকার কথাও নয় কারণ আমাদের ইতিহাস আমাদের অতীতের একাংশ বিস্মৃতির গভীরে পাঠিয়ে দিয়েছে। এঁরা সকলেই ভারতের ফার্সি ভাষার কবি। আর এঁদের কারো জন্ম ভারতে আর কারো জন্ম সুদূর পশ্চিম এশিয়াতে যাঁরা ভারতের দিল্লির দরবারের এবং নাগরিক সভ্যতার খ্যাতি শুনে সেই শহরে আশ্রয় নেন এবং সেই শহরের মৃত্তিকাতে মিশে যান।

এদের মধ্যে সারমান্দ কাশানি আমার প্রিয় চরিত্র ছিলেন। সারমান্দ কাশানি ১৫৯০ ,১৬৬১ সল্ অধি বেঁচে ছিলেন। তিনি জন্মেছিলেন সুদূর আর্মেনিয়াতে। জন্ম সূত্রে ছিলেন ইহুদি। তার মূল পেশা ছিল তিনি ছিলেন হিরে জহরতের ব্যবসায়ী। কিন্তু চিন্তায় ছিলেন অধ্যাত্মবাদী। ভারতে তিনি ঘুরতেন তাঁর পণ্য সামগ্রী বিক্রির জন্যে। সে যুগে মুঘল আমলে ভারতের খ্যাতি ছিল ব্যবসার জন্যে। সারমান্দ ফার্সি শিখেছিলেন। সেকালের ভারতের সিন্ধু প্রদেশে থাট্টা শহরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় অভয় চাঁদ বলে এক ব্যক্তির। তাঁর সঙ্গে মিলে তিনি অনুবাদ করেন ঠদ্রন্স্থ , ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট। সারমান্দ হয়ে যান সন্ন্যাসী। চুল দাড়ি কাটা বন্ধ করে দেন তিনি। তিনি আর অভয় চাঁদ দিল্লিতে আসেন। সে যুগে কবি হিসাবে সারমান্দ কাশানির খ্যাতি ছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ছিল সাধক হিসাবে। ফরাসি ভারত ভ্রমনকারী ফ্রাঁসোয়া বের্নিয়ের তাঁকে বর্ণনা করেছেন নাঙ্গা ফকির বলে। কাশানির সাধনা এবং কবিতার কথা শুনে মুঘল শাহজাদা দ্বারা সিকাহ তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান। দ্বারা ছিলেন সুফী সাধক এবং সত্যের অনুসন্ধানকারী। তিনি সারমান্দ এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাদশাহ ঔরংজেব মুঘল গৃহ যুদ্ধে জিতলে আবার সারমান্দ কে বন্দি করেন এবং তাঁর শিরোচ্ছেদ করেন।

দিল্লিতে আমার মা ঘনিষ্ঠ বন্ধু আধুল মাজিদ যিনি ছিলেন দিল্লী স্কুল অফ ইকোনমিক্স এর গবেষক তিনি আমায় তাঁর কথা বলেন দিল্লির জামা মসজিদের চাতালে বসে । শেষ বিচারে সারামান্দ কে বলা হয় কলমা বলতে ,সারামান্দ বলেন ঈশ্বর নেই কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন আল্লাহই একমাত্র ঈশ্বর। যাঁরা মুসলমান তাঁরা জানবেন there is no God but God এর মানে কি। তিনি তাঁর নশ্বর দেহে শেষ বিচারে সুফী রহস্যের কথা বলেন–

The Mullahs say Ahmed went to heaven– Sarmad says that heaven came down to Ahmed

"There was an uproar and we opened our eyes from the eternal sleep. Saw that the night of wickedness endured– so we slept again."

আমার মনে হয় আমরা এক দুঃস্বপ্নের রাত্রির মধ্যে দিয়ে চলেছি। কিছুদিন আগে আমি মুখবইতে একটা লেখা দিয়েছিলাম পারস্যের সুফী কবিদের নিয়ে। আমার বন্ধু এমানুলের মুখবইয়ের পাতায় একজন বলেছিলেন এটি অনৈতিহাসিক লেখা কারণ রুমি , ওমর খৈয়াম , হাফিজ ফিরদৌসীর ইরান না কি খোমেনীর ইসলামী বিপ্লবের ফলে মৃত্যুবরণ করেছে। সংস্কৃতি কি মৃত্যু বরণ করতে পারে ? একটি দেশ কি তার ঐতিহ্য শূন্য হয়ে যেতে পারে ? ভারতে এখন কেউ আমার উল্লেখিত কবিদের কথা পড়েন না। কেন জানি না ? কিন্তু ইরানের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির সম্পর্ক বহুদিনের। ফার্সি এক সময়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজের ভাষা ছিল। ফার্সি কবি ওমর খৈয়াম তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ী ছিলেন। আমার সন্দেহ আছে বাংলাদেশে এখন শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাঁরা ওমর খৈয়াম নিয়ে নাচানাচি করেন তাঁরা এ কথা জানেন কি না।

আসলে আমি ইচ্ছে করে এখানে মধ্য যুগের নাটকীয় কবির গল্প তুলে ধরলাম সারমান্দ বা অভয় চাঁদ কেউই মুসলমান ছিলেন না কিন্তু সংস্কৃতিতে ফার্সি ঘরানার মানুষ ছিলেন।। আজকের এই প্রতিবেদনের লেখক মানে আমিও মুসলমান নই কিন্তু ভারতের সংস্কৃতি তার ইতিহাস কি আমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে।

এক কালে ইরান ও তেহরান ছিল ইহুদি সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র , বাগদাদের মতো।সেই ইতিহাস কে কেউ মুছে ফেলতে পারবেন ? নেতা নেহি হু আর ট্রুম্পি হয়তো ইতিহাস মুছে দিতে পারবে , কানাডাতে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কে প্রতিটি শ্রেণী পাঠের আগে স্মরণ করতে হয় কানাডার আদিম জনগোষ্ঠীর ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ছিল শিকারে যাবার আগে মিলন ক্ষেত্র। হয়তো সেরকম ভাবে কদিন বাদে স্মরণ করা হবে ইরান এক সময়ে প্রাচ্যের বা আসার সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র ছিল আর প্রাচীন সংস্কৃতর মতো ফার্সি ছিল বহু জনপদের ভাষা। বহুদিন আগে Zack Snyder এর ৩০০ বলে হলিউডের একটি ছবির উপরে ক্রেইগ চ্যাম্পিয়ন , এলিজাবেথ ল্যাশকুইন এবং আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম প্রাচীন পারস্য এবং গ্রিসের সংঘর্ষের আধুনিক নির্মাণের উপর ভাইস বলে পত্রিকাতে।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

জাতীয় জরুরি অবস্থার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তির প্রাসঙ্গিকতা

মজিবুর রহমান

স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত অধ্যায় বোধহয় জাতীয় জরুরি অবস্থা। ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রবর্তনের ২৫ বছর পর ১৯৭৫ সালে দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। সংবিধানের ৩৫২ নাম্বার ধারার প্রয়োগ ঘটিয়ে এই ঘোষণা করা হয়। জরুরি অবস্থা জারি সেই অর্থে অসাংবিধানিক না হয়েও সাংঘাতিকভাবে ভারতীয় সংবিধানের স্পিরিট বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও চরম অগণতান্ত্রিক আচরণের দৃষ্টান্ত। ইমার্জেন্সী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাষণ আমলের (১৯.১১.১৯১৭-৩১.১০.১৯৮৪) ঘটনা। এজন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আজও কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করে।কংগ্রেসের এই অস্বস্তি বাড়াতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ২৫শে জুনকে' সংবিধান হত্যা দিবস ' হিসেবে পালন করার কথা ঘোষণা করেছে।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর (২.১০.১৯০৪-১১.১.১৯৬৬) প্রয়াণের পর ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৬৬ সালের ২৪শে জানুয়ারি। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার ৫২০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৮৩টিতে জয়লাভ করে এবং ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পার্টির নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন এবং দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন অংশটি কংগ্রেস (রিকুইজিশন) ও তাঁর বিরোধী অংশটি কংগ্রেস (অর্গানাইজেশন) নামে পরিচিত হয়।ইন্দিরা গান্ধীর সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। ডিএমকে সহ একাধিক বাম দলের সমর্থন নিয়ে তিনি সরকার টিকিয়ে রাখেন। কিন্তু সরকার পরিচালনায় তাঁর দাপট অন্তর্হিত হয়। এমতাবস্থায় তিনি একটি ঝুঁকি নেন। ১৯৭০ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তাঁর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি মেয়াদ শেষ হওয়ার পনের মাস আগে লোকসভা ভেঙে দেন। স্বাধীন ভারতে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একযোগে আয়োজনের দুই দশকের পরম্পরাও ভেঙে যায়। নির্ধারিত ১৯৭২ সালের পরিবর্তে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পঞ্চম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস (আর) ৩৫২টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে, কংগ্রেস (ও) মাত্র ১৬টি আসন জিততে সমর্থ হয়। ইন্দিরা গান্ধীর এই ভূমিধস জয় সত্ত্বেও তাঁর বিরোধীরা মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হননি। তাই কংগ্রেস নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে অজস্র কর্মসূচি গ্রহণ করা হতে থাকে।

১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলি কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টির প্রার্থী রাজ নারায়ণকে (২৩.১১.১৯১৭-৩১.১২.১৯৮৬) এক লাখ এগারো হাজার আটশো দশ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। রাজ নারায়ণ এই ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করেন। '৭১-এর ২৪শে এপ্রিল রায়বেরেলির নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি আবেদন দাখিল করেন। ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি মেশিনারি ব্যবহার, মদ ও কম্বল বিতরণ করে ভোটারদের প্রভাবিত করা, প্রচারণা ব্যয়ের সীমা অতিক্রম করা প্রভৃতি নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়। ইন্দিরা গান্ধী ও রাজ নারায়ণের পক্ষে যথাক্রমে ননী পালখিওয়ালা ও শান্তি ভূষণ মামলা লড়েন। ইন্দিরা গান্ধীকে সশরীরে হাজিরা দিতে হয়। চার বছর পর ১৯৭৫ সালের ১২ জুন তারিখে মামলার রায়ে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনকে অবৈধ বলা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পদে তাঁর অধিষ্ঠিত থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং ছয় বছরের জন্য তাঁকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এতটা কড়া রায় কেউই ভাবতে পারেননি।

ইন্দিরা গান্ধী এলাহাবাদ হাইকোর্টের অপ্রত্যাশিত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু '৭৫-এর ২৪শে জুন সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অবকাশকালীন বেঞ্চ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। তবে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি দুই-তিন জন ঘনিষ্ঠ অনুগামীর সঙ্গে আলোচনাক্রমে একটি নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেন। 'অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার কারণে ভারতের নিরাপত্তার জন্য আসন্ন বিপদ'-এর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ ২৫শে জুন রাতের বেলা জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। '৭৫-এর ৭ই নভেম্বর অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে বাতিল করে দেয়। ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনের বৈধতা স্বীকৃত হয় এবং তাঁর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা অপসারণ করা হয়। আদালতের অঙ্গনে ক্লিনচিট পেলেও রাজনীতির ময়দানে ইন্দিরা গান্ধী স্বস্তি ফিরে পাননি। তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধীদের লাগাতার জঙ্গি আন্দোলন ও কর্মসূচি গ্রহণ অব্যাহত থাকে। তিনিও বিরোধীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে জরুরি অবস্থা চালিয়ে যেতে থাকেন।

জরুরি অবস্থায় গণতন্ত্র বিপন্ন হয়। বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হয়। সংবাদ পরিবেশনের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ

করা হয়। শ্রমিক ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হয়।প্রতিরোধমূলক আটক আইনের অধীনে লক্ষাধিক রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সমাজকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও জামাত-ই-ইসলামির মতো কিছু সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়। রাজ্য সরকারগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র সঞ্জয় গান্ধী (১৪.১২.১৯৪৬-২৩.৬.১৯৮০) কোনো সরকারি পদ না থাকা সত্ত্বেও সরকারে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য তিনি বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন।অভিযোগ ওঠে প্রায় এক কোটি পুরুষের ভ্যাসেকটমি করা হয়েছে। তাঁর নগর পুনর্নবীকরণ কর্মসূচির অধীনে অজস্র কুঁড়েঘর ও বস্তি ভেঙে ফেলা হয় এবং এর ফলে কয়েক লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। নির্বাহী বিভাগের অস্বাভাবিক গুরুত্ব বৃদ্ধি গণতন্ত্রের তিনটি শাখার- আইন, বিচার ও নির্বাহী-মধ্যেকার ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের স্বৈরশাসক হয়ে ওঠেন। ৩৯তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ৩২৯ক অনুচ্ছেদ প্রবর্তন করা হয় যাতে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধকে বিচার বিভাগের পর্যালোচনার বাইরে রাখা হয়। সুপ্রিম কোর্ট ৭ই নভেম্বর '৭৫ এই ধারাটিকে অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করে। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সোশ্যালিস্ট' ও 'সেকুলার' শব্দ দুটি সংযুক্ত করা হয়।

দমনপীড়ন সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ও শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৯৭৭ সালের ১৮ই জানুয়ারি ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণা করা হয়। ১৬-২০ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে মার্চ ইমার্জেন্সী প্রত্যাহৃত হয়। ২১ মাসের জরুরি অবস্থার অবসান ঘটে। নির্বাচনে জনতা পার্টির জোট ২৯৫টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে ইন্দিরা গান্ধীর দল পায় ১৫৪টি আসন। রায়বেরেলি কেন্দ্রে রাজ নারায়ণের কাছে ইন্দিরা গান্ধী ৫৫২০২ ভোটে পরাজিত হন। দেশের মানুষ ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দলকে শাস্তি দেয়। মোরারজি দেশাইয়ের (২৯.২.১৮৯৬-১০.৪.১৯৯৫) নেতৃত্বে কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসি সরকার গঠিত হয়। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এই সরকার বেশিদিন টেকেনি। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী স্বমহিমায় ফিরে আসেন। দেশবাসী ইন্দিরা গান্ধীর ইমার্জেন্সীর অপরাধকে ক্ষমা করে দেয়। তাঁর দল ৩৫৩টি আসনে জয়লাভ করে এবং তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন।

ইমার্জেন্সী ভারতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয় না। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে খারাপ ফল করেন। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মধ্যেই ১৯৮০ সালের নির্বাচনে তিনি দুর্দান্তভাবে কামব্যাক করেন। কাজেই যে ইমার্জেন্সীর প্রভাব পাঁচ বছর স্থায়ী হয়নি তার পঞ্চাশ বছর পূর্তি নিয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হতে পারে না।

ইমার্জেন্সীকে সংবিধান হত্যার সমান ধরা হলে বলতে হয় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ইমার্জেন্সী জারি না করেও সংবিধানের সর্বনাশ করে চলেছে। গত এক দশকে ভারত রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মজবুত হবার পরিবর্তে ভঙ্গুর হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বলে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। সরকার ও শাসকদলের তল্পিবাহকে পরিণত হয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'গোদি মিডিয়া' নাম পরিগ্রহ করেছে। এজন্য বিশ্ব সূচকে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের অবস্থান নিম্নমুখী হতে দেখা যাচ্ছে। সরকার বিভিন্ন ভাবে বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। বিচারপতিদের সঙ্গে শাসকদলের অশোভনীয় সখ্যতা গড়ে উঠছে। এজন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরেই রাজ্যসভার সাংসদ হয়ে যান। কোনো বিচারপতি স্বেচ্ছাবসর নিয়ে শাসকদলের টিকিটে লোকসভার সদস্য হন। প্রধান বিচারপতির পারিবারিক অনুষ্ঠানে হাজির হন প্রধানমন্ত্রী। জরুরি অবস্থার সময় যেভাবে দেশ পুলিশ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল বর্তমানে সেভাবেই সিবিআই, ইডি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় এজেন্সির মাধ্যমে বিরোধীদের হয়রানি ও ধড়পাকড় চলছে। সাতের দশকের মিসা এখন নাম পাল্টে হয়েছে ইউ এ পি এ; বিনা বিচারে কারাদণ্ড। জনজাতি অধিকার কর্মী ফাদার স্ট্যান স্বামীর (২৬.৪.১৯৩৭-৫.৭.২০২১) মর্মান্তিক পরিণতি অথবা ছাত্র নেতা উমর খালিদের ভোগান্তির কথা আমরা সকলেই জানি। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে বিরোধীদলের রাজ্য সরকারকে ভেঙে দেওয়ার যে প্রবণতা ছিল তা এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু বিধায়কদের দলত্যাগ করিয়ে সরকারের বদল ঘটিয়ে দেওয়ার প্রবণতা নরেন্দ্র মোদির আমলে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫০ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া হয়েছিলেন আর এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দলে ও সরকারে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রেখে আত্মপ্রচারে মগ্ন থাকেন। দলের ভেতরে-বাইরে প্রবল চাপের মুখে পড়ে ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরশাসক হন আর নরেন্দ্র মোদি অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে একনায়ক হতে চেষ্টা করেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করেন কিন্তু নরেন্দ্র মোদি সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ঘনীভূত করার জন্য তা সরিয়ে দিতে চান।

জরুরি অবস্থা ভারতীয় রাজনীতিতে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তা নিরাময় হতে বেশি সময় লাগেনি। খুব বেশি স্বেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী হয়ে কোনো নেতা ভারতে রাজ করতে পারেন না। ভারতের সংবিধান ও সংস্কৃতি সেটা অনুমোদন করে না। বহুত্ববাদী ভারতে বেশিদিন দেশবাসীর কণ্ঠরোধ করা যায় না। ভুল বুঝিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যতটা সহজ ভয় দেখিয়ে মানুষের সমর্থন পাওয়া ততটাই কঠিন। ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার এটাই শিক্ষা এবং প্রাসঙ্গিকতা। (লেখক মুর্শিদাবাদ কাবিলপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক)।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতির দাবি
হাতে হাতে কাজ চাই
পাতে পাতে ভাত চাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতির এক দীর্ঘ ও ধারাবাহিক লড়াইয়ের জয় এলো গত ১৮ জুন, ২০২৫। এই দিনে কোলকাতা হাইকোর্টের রায়ে কেন্দ্র সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হল আগামী ১ আগস্ট, ২০২৫ থেকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন (নারেগা) অনুসারে ১০০ দিনের কাজ পুনরায় চালু করতে হবে। সুদীর্ঘ ৩ বছর ৬ মাস যাবৎ কাজ না পাওয়া রাজ্যের লক্ষাধিক বেকার, অর্ধাহারে থাকা শ্রমিকের কাছে এই রায় শুধু ক্ষুধার ক্ষুন্নিবৃত্তি নয় একই সাথে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার উপায়। আগস্ট মাস হল মাস, এবারের আগস্টের ১ তারিখ তাঁদেস্বাধীনতারর কাছে নতুনভাবে যেন স্বাধীনতার আলো নিয়ে এলো, মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা।

অর্জিত অধিকার হরণের দিনগুলি

আমরা জানি, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতি সহ সারা ভারত জুড়ে বহু গণসংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের দীর্ঘ ১৯ বছর লড়াইয়ের ফলে ২০০৬ এর ২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন কেন্দ্রের ইউ.পি.এ সরকার মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন প্রণয়ন করে। আইনি অধিকার অর্জনের প্রতিটি স্তরে, 'কাজের অধিকার'-এর দাবিতে গণজমায়েত হোক বা দিল্লি পর্যন্ত সাইকেল মিছিল করে পৌঁছে যাওয়া হোক, তাদের লড়াই তার সাফল্যলাভ করে ওই দিন। সত্যি বলতে কি, 'গাঁয়ে থাকবো, গাঁয়ে খাটবো, ভিটেমাটি ছাড়বো না' তাদের দীর্ঘদিনের শ্লোগানের বাস্তবায়ন হল ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে। প্রকল্পটি গ্রামবাংলায় বড় বদল আনলেও আমরা দেখেছি কীভাবে বিভিন্ন পরিসরে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ করা হয়েছে।খেতমজুররা প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে।

২০২১ সালে পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেয়। প্রথমে ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে মজুরি বন্ধ করা হয় এবং পরে ২০২২ সালের জুলাই মাস থেকে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করা হয়। এ ছিল পশ্চিমবঙ্গের খেটে খাওয়া মানুষের ওপর দেশের স্বাধীনতার পরে সবথেকে বড় অধিকার হরণের ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন শ্রমজীবী মানুষকে যে অধিকার দিয়েছিল কেন্দ্র সরকারের এই অন্যায় সিদ্ধান্তের ফলে তা সরাসরি লঙ্ঘিত হল। ৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে কেন্দ্র সরকার নারেগা আইনের ২৭ নম্বর ধারা মোতাবেক ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। যদিও এই সংক্রান্ত কোন বিজ্ঞপ্তি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটে নেই, এত বড় একটি শ্রমিক বিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল শ্রমিকদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে। এই নির্দেশনামায় বলা হল ২০২২ এর ৯ মার্চের আগের সকল মজুরি কেন্দ্র সরকার মিটিয়ে দেবে, বলা হয় রাজ্য সরকারকে নিজ তহবিল থেকে ১০০ দিনের কাজ চালাতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এসবের কিছুই হয়না। পরিশ্রমের মজুরি না পেয়ে, কাজ হারিয়ে এক চরম বিপদের সামনে পরেন পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ শ্রমিক।

সহজ ছিল না পথের লড়াই

শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার হরণের বিপক্ষে, তাঁদের জীবন-জীবিকা রক্ষার স্বার্থে এরপর শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতির এক সর্বাত্মক লড়াই। আমরা জানি, সর্বস্তরে দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গের এক নির্মম বাস্তবতা। ১০০ দিনের কাজ নিয়ে পঞ্চায়েত পর্যায়ে দুর্নীতি এখন সর্বজনস্বীকৃত,tanraসমিতিরপক্ষে একাধিকবার অভিযোগ তুলে ছিলাম এই বিষয়ে। দুর্নীতির ফলে মকেরাই তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাঁরাই, এই ছিল আমাদের বক্তব্য। দুর্নীতির বিষয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক কেউ তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। কেন্দ্র সরকারের দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমাদের স্পষ্ট অবস্থান, এই বিষয়ে যথোপযুক্ত তদন্ত হোক, 'চোর ধরা' হোক। কিন্তু তা না করে বন্ধ করা হল কাজ, বকেয়া মজুরি মেটানো হল না। দুর্নীতি করেও গায়ে আঁচ লাগলো না দুর্নীতিতে যুক্ত কেষ্টবিষ্টুদের। অথচ দুর্নীতির শিকার হলেন গ্রাম বাংলার শ্রমিকেরা।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতির পক্ষ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ব্লকের নারেগা প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৭ (প্রতারণা) এবং ৪১৮ (ক্ষতি হবে জানা সত্ত্বেও প্রতারণা) ধারাতে বিভিন্ন থানায় অভিযোগ জানানো হয়। মধ্যমগ্রাম থানায় অভিযোগ জানানো হয়

কেন্দ্র সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের সচিবের বিরুদ্ধেও। কিন্তু বাস্তবতা হল, এত অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোন প্রশাসনিক তদন্ত বা আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হয়না।

এরপর পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই ২৪ পরগণা, নদিয়া সহ সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয় বকেয়া মজুরি আর কাজ চালুর দাবিতে আমাদের পথসভা, পথ অবরোধ। সমিতির সদস্যেরা বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করে 'ভারত জোড়া যাত্রা'-র সময়। ১১ জানুয়ারি, ২০২৫- এ বিভিন্ন গণ সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে প্রায় ৫০০ শ্রমিক বিজেপি রাজ্য দপ্তর ঘেরাও করে। সুদীর্ঘ এই সাড়ে তিন বছরে বাংলার ব্লক অফিসে, পঞ্চায়েত অফিসে দেখা গেছে সমিতির মিছিল, শোনা গেছে দৃপ্ত শ্লোগান, 'হাতে হাতে কাজ চাই, পাতে পাতে ভাত চাই', '১০০ দিনের কাজ চালু করতে হবে, বকেয়া মজুরি দিতে হবে'।

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছে রাজ্যের বাইরেও। নারেগা সংঘর্ষ মোর্চার উদ্যোগে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৫০০০ এর বেশি শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১ টাকা করে পাঠান। বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাংসদদের নিয়ে সভা করা হয় যাতে সংসদে এই ইস্যু তোলা হয়। কাজ শুরুর দাবিতে সমিতির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গেও দেখা করা হয়। সরকারি দপ্তরে কড়া নাড়ানো হোক বা পথের আন্দোলন এমন কোন মাস ছিল না, এমন কোন সপ্তাহ ছিল না যেদিন বন্ধ থেকেছে আমাদের কর্মসূচি।

আইনি লড়াই

পথের লড়াইয়ের সাথে সাথে আইনি লড়াই শুরু করা হয়। ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর নারেগা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির দাবি নিয়ে কোলকাতা হাইকোর্টে এক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে সমিতি [WPA (P) ৫৭৮/২০২২]। ৯ জানুয়ারি, ২০২৩ হাইকোর্ট রায় দেয় যে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতিকে বকেয়া মজুরির হিসাব নিয়ে জেলা ভিত্তিক জেলা শাসকের কাছে জমা দিতে হবে। অভিযোগ পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে জেলাশাসকেরা দায়বদ্ধ থাকবেন এই বিষয়ে মীমাংসা করার জন্যে। হাইকোর্টের রায় অনুসারে সমিতির পক্ষ থেকে ২০২৩ এর জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে জেলাশাসকের দপ্তরে বকেয়া মজুরির হিসাব জমা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের ২১ টি জেলায় জেলাশাসক সমিতির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত করেন এবং প্রদত্ত তথ্য যে সঠিক তা মেনে নেন। তবে এও জানান যে কেন্দ্র সরকার টাকা না দিলে বকেয়া মজুরি দেওয়া যাবে না।

২০২৩ এর মে মাসে বকেয়া মজুরির দাবিতে আবার জনস্বার্থ মামলা [WPA (P) ২৩৭/২০২৩] দায়ের করে সমিতি। এরপর চলতে থাকে তারিখের পর তারিখ, কখনও তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয়, কখনও ক্রমতালিকায় এগিয়ে থাকা সত্তেও পিছিয়ে যায়। ২০২৩ ,এর নভেম্বরে কোলকাতা হাইকোর্টে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির অনুরোধ জানিয়ে সমিতির উদ্যোগে ৯ টি জেলা থেকে প্রায় ৮০০০ শ্রমিক প্রধান বিচারপতির উদ্দেশ্যে পোস্টকার্ডে চিঠি পাঠানো হয়। বিচারপতি ২০২৪ এর জানুয়ারিতে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করতে বলেন, কমিটির কাজ হবে সঠিক শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণ ও বকেয়া মজুরি নির্ধারণ।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতির ঐতিহাসিক জয়

অবশেষে দীর্ঘ টানাপড়েনের পর গত ১৮ জুন এলো ঐতিহাসিক রায়। কোলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতির দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে রায় দেন-

১। কেন্দ্র সরকারকে ১ আগস্ট, ২০২৫ থেকে ১০০ দিনের কাজ চালু করতে হবে।

২। কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজ চালু হওয়ার পরে দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবে ও শর্ত রাখতে পারবে।

৩। দুর্নীতির অভিযোগের যে তদন্ত চলছিল তা চলতে থাকবে।

৪। সরাসরি টাকা চলে যাবে শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-- এ।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতি এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছে। আমরা একইসাথে 'নারেগা সংঘর্ষ মোর্চা' সহ সারা দেশে ও রাজ্যে বিভিন্ন গণসংগঠন এই লড়াইয়ে যারা আমাদের পাশে থেকেছেন, তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই লড়াইয়ে পাশে থাকা আইনজীবী, সাংবাদিক, সমাজমাধ্যমকর্মীদের।

রায়দানের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্রেডিট নেওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। এক্ষেত্রে শাসক বিরোধী কেউ কম যায়না। আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই মিথ্যা দাবি করলেই তা সত্য হয়ে যায় না। দুর্নীতি করে এই প্রকল্প আটকে দেওয়ার জন্যে সরাসরি দায়ি রাজ্যের শাসক দল, একই সাথে সাধারণ মানুষের পেটে লাথি মেড়ে, মূল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে, উপরন্তু টাকা আটকে রাখার জন্যে দায়ি কেন্দ্রের শাসক দল। লক্ষ লক্ষ গ্রামের মানুষের দুর্ভোগের জন্যে দায়ি যারা আজ তারাই কৃতিত্ব নিতে উঠেপড়ে মাঠে নেমেছে। ধিক এই মিথ্যার ব্যবসাদারদের।

আমাদের দাবি

১। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইনের অধীন প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজ চালু করতে হবে।

২। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইনের অধীন প্রকল্পে ৮০০ টাকা দৈনিক মজুরি চালু করতে হবে।

৩। পরিবার পিছু নয়, জব কার্ড অনুসারে কাজের বণ্টন করতে হবে।

৪। দুর্নীতি প্রতিরোধে নজরদারি ব্যবস্থার জন্য আইনি ও প্রশাসনিক ব্যাবস্থাপনা রাখতে হবে, নজরদারিতে সাধারণ মানুষকে সামিল করতে হবে।

৫। ১০০ দিনের কাজ সংক্রান্ত হিসাব, কর্ম বিন্যাস/বণ্টন জনসমক্ষে নিয়মিত জানাতে হবে।

কালিগঞ্জে ও দক্ষিণ কলকাতার ঘটনায় অভিযোগের তীর শাসক দলের দিকে

অমিতাভ সিংহ

গত কয়েকদিনে রাজ্যে দুটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও লজ্জাজনক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। প্রথমটি গত ২৩ জুন কালীগন্জ বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা চলাকালীন তৃণমূলের উন্মত্ত বিজয় মিছিল থেকে ছোঁড়া সকেট বোমার আঘাতে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী নয় বছরের তামান্না খাতুনের মৃত্যু। দ্বিতীয়টি হল গত বৃহস্পতিবার ২৫ জুন সন্ধায় কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ক্যাম্পাসে সেই কলেজের ছাত্রীর গণধর্ষন ও শারিরিক নিগ্রহ হওয়ার সংবাদ। দেখা গেল উক্ত কলেজের দুই ছাত্রর সহায়তায় তৃণমূলেরই এক প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও কলেজের অস্থায়ী কর্মী জনৈক বিধায়কের আশীর্বাদধন্যা মনোজিত মিশ্র নিরাপত্তা রক্ষীর ঘরে নিয়ে গিয়ে উক্ত ছাত্রীটিকে হকি স্টিক দিয়ে প্রহার করে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ধর্ষণ করেছে। এমনকি সেই ঘটনার ভিডিও তুলে তা দিয়ে ছাত্রীটিকে ব্ল্যাকমেল করার পরিকল্পনা ছিল অভিযুক্তদের।

খবরে প্রকাশ এই মনোজিত গত ১২ বছর ধরে একের পর এক অপরাধ করেই চলেছে। ২০১৩ সালে কালীঘাট চত্বরে এক যুবকের বুকে ছুরি বসিয়ে ফেরার। ২০১৭ সালে আইন কলেজে ভর্তি হয়ে ভাঙচুর,২০২২ সালে কলেজের এক ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ,টাকা হাতানো,হুমকি, র‍্যাগিং,মারধোর সবরকম অপরাধের সঙ্গেই সঙ্গে তার সংযোগ থাকলেও পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরেই ছিল সে। কলেজে সে ছিল অলিখিত গভর্নিং বডি। খোদ অধ্যক্ষও ছিলেনতার অধীনে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আগে ও পরে হিংসার একটা ঐতিহ্য আছে। সেটা গোটা দেশের কাছে আমাদের মাথা হেঁট করিয়ে দেয়। লোকসভা,বিধানসভা,পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যবাসী রক্তাক্ত হয় নি এমন ঘটনা রাজ্যবাসী কবে দেখেছেন তা কি কারও মনে পড়ে? কিন্তু কালীগঞ্জ বিধানসভা আসনে সামান্য এক উপনির্বাচনে তৃণমূল আশ্রিত দুবৃত্তরা যেভাবে বিরোধী দলের সমর্থকের বাড়ী লক্ষ করে সকেট বোমা ছুড়ছিল তা অভুতপূর্ব , বিশেষ করে যখন তাদের জয় নিশ্চিত। বোমার স্প্রিন্টারের আঘাতে মারা গেল মোলান্দী গ্রামের বছর নয়েকের শিশু তামান্না খাতুন। পুলিশ একে দুর্ঘটনা বলে চালাতে গেল। শিশুটির মা সাবিনা ইয়াসমিন এফআইআরে পঁচিশ জনের নাম দিলেন। যখন পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের কাছে বিরোধী দলগুলি বার বার সুরক্ষা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আবেদন করেছিল তখন নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে কেন তৃণমূল কংগ্রেস বিজয় মিছিল বের করতে পারল ? মাত্র দশ মাসের জন্য যে নির্বাচন তাতেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আগামী বছর ২৯৪ টি আসনের নির্বাচনে কত প্রাণবলি হতে পারে ভেবেই আঁতকে উঠতে হয়।

১৮ বছর আগে দিনটা ছিল ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সাল। এই নদীয়া জেলার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়র রিজানুর রহমানের দেহ পাওয়া যায় রেললাইনের ধারে। বোঝাই গেল অশোক টোডীর কন্যার সঙ্গে প্রেমঘটিত সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে এই খুন। সেদিন মমতা ব্যানার্জী আওয়াজ তুলেছিলেন ‘ইনসাফ চাই’। রিজানুরের মাকে আম্মাজান সম্বোধন করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন তাঁকে ইনসাফ এনে দেবেন তিনি। ইনসাফ কি আদৌ এসেছে গত ১৪ বছরের শাসনক্ষমতায়? বরং এর সুবিধা নিয়েছে রিজানুরের দাদা রুকবানু রহমান। আর অশোক টোডি আজ তৃণমূলের মাড়োয়াড়ি সংগঠনের নেতা। তৎকালীন বাম সরকার যেসব পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করেছিল আজ তারা প্রমোশন পেয়ে বহাল তবিয়তে চাকরি করছেন। ক্ষমতায় আসার পর মেধাবী ছাত্র আমতার আনিস খানকে পুলিশ তার বাড়ীতে গিয়ে খুন করে। সালটা ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একবারও তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন নি।

৮ আগস্ট ২০২৪ মধ্যরাত্রে আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত এক ডাক্তার অভয়া ধর্ষিতা হয়ে খুন হলেন। শুধু রাজ্য নয় ভারতের সর্বত্র এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে চিকিৎসক সমাজ তো বটেই সাধারণ মানুষ পথে নামলেন। রাত জাগলেন রাজ্যের মানুষ বিভিন্ন জায়গায়,জেলায় জেলায়।তারা স্লোগান দিলেন জাস্টিস ফর আর জি কর।এখনও অভয়া মঞ্চ নামে প্রতিবাদী কণ্ঠের আওয়াজ মিলিয়ে যায় নি। সুপ্রীম কোর্টে লড়াই এখনও জারি রয়েছে। আগে কামদুনি,পার্ক স্ট্রিট, কাকদ্বীপ, রানাঘাট ইত্যাদি জায়গায় বিভিন্ন ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও তা অভয়ার ঘটনার মত এতদিন মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। সবথেকে আশঙ্কার কথা এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর দল তৃণমূল জড়িত। তা সে আর জি কর বলুন বা সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজই বলুন। আসলে তৃণমূলের নেতৃত্বে সারা

রাজ্যে এক দুবৃত্তরাজ কায়েম হয়েছে। মহিলাদের সম্মান ও নিরাপত্তা আজ তলানিতে। সম্প্রতি গরু পাচারে অভিযুক্ত বীরভূমের জেল খাটা নেতা অনুব্রত মন্ডল যে ভাষায় বোলপুর থানার ওসির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন ও তার মা ও স্ত্রী কে জড়িয়ে তাতে এই দুবৃত্তরাজের উদাহরণ পাওয়া যায়। একইসঙ্গে দুর্নীতির শীর্ষে পৌঁছে গেছে এই দলের সর্বস্তরের নেতারা। বালি পাচার,গোরু পাচার,কয়লা পাচার, স্কুল, পৌরসভা --- বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ দুর্নীতি, ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, শিক্ষা দুর্নীতি কোন জায়গায় বাদ আছে? দুর্নীতির আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে তৃণমূল দলটি। মমতা ব্যানার্জী এইসব মহানদের কখনও কখনও দল থেকে সাসপেন্ড করবেন। আবার কদিন পর দেখা যাবে নির্বাচনী বৈতরণী পার করার সময় এরাই দলের সোনার টুকরো হয়ে বুথ দখল থেকে মানুষদের ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

কলেজে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে এক শ্রেণীর তথাকথিত ছাত্রনেতা তৈরী হয়েছে যারা পুরো কলেজকেই চালনা করে।ছাত্র সংসদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয়, মোটামুটি বছরে ৫ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা, যা কোন নির্বাচিত ছাত্র সংসদের খরচ করার কথা তা নিয়ন্ত্রন করে কতিপয় তোলাবাজ ও দুবৃত্তরা। কলেজে ভর্তির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের না দিলে কলেজে ভর্তি হওয়া দুঃসাধ্য। কোনভাবে ভর্তি হলেও ওইসব নেতাদের চাহিদামত টাকা দিলে ক্লাস করতে অসুবিধা হবে,পরীক্ষায় বসতে পারবে না। আরও কতরকম লাঞ্ছনা তাকে সহ্য করতে হবে তা অজানা। ছাত্রী হলে নিজের সতীত্ব এমনকি জীবনও দিতে হতে পারে। কলকাতা,বর্ধমান,উত্তরবঙ্গ ইত্যাদি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজ গুলিতে ছাত্র সংসদের শেষ নির্বাচন হয় ২০১৭ সালে। প্রেসিডেন্সীতে ও যাদবপুরে ভোট হয় যথাক্রমে ২০১৯ ও ২০২০ সালে। রাজ্যজুড়ে ৩০ টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫০০ এরও বেশী কলেজে ভোট হবার কথা বহুদিন আগেই। সরকার তা করছে না কারণ তাহলে তৃণমূলিদের মৌরসিপাট্টা শেষ হয়ে যাবে ভোট হলে। গত বছরের ২৮ আগস্ট এক ছাত্র সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন পূজার পড়েই ছাত্র সংসদের ভোট হবে। তা তো হল না। ২৯ মার্চ ২০২৫ সালে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ দিল দু সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে কবে ও কিভাবে এই ভোট করতে চায়। রাজ্য এবিষয়ে কোন গাইডলাইন জমা না দিয়ে বার বার সময় নিয়ে যাচ্ছে। আজ এই অপব্যবস্থার প্রোডাক্ট এই মনোজিত মিশ্ররা তা কি অস্বীকার করা যায়? তারই মাঝে তৃণমূলের বিধায়ক ও সাংসদ নির্যাতিতার দিকে আঙুল তুলে যে ধরণের মন্তব্য করলেন তাতে তাদের সংবেদনশীলতার অভাব বললে ভুল বলা হয়,তাদের মনুষ্যোচিত জীব হিসাবে গণ্য করতে অসুবিধা হয়।

শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবি মঞ্চের তরফে সভাপতি বিশিষ্ট নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী ও সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী সঠিকভাবে বলেছেন যে এই ঘটনা ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানীর শিক্ষা সংস্কৃতির গৌরবের প্রতি এক বিধ্বংসী আঘাত।

এই বিভৎস ঘটনাটি ঘটেছে আমাদেরই রাজ্যে। সারা দেশের মানচিত্রে এখন এই রাজ্য এই ধরণের কাজকর্মের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে তা বলাই বাহুল্য। তবে বর্তমানে শাসক দল তৃণমূল যে ধরণের দুর্নীতি ও হিংসার নজির গড়েছে তা তুলনাহীন। আশঙ্কা হয় এর ফলে হিন্দুত্ববাদীদের এরাজ্যে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে না তো? সংখ্যালঘুদের জন্য সত্যিকারে কোন উন্নয়ন না করে তাদের অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে তাদের শুধু তোষণ করার ফলে আরএসএসকে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। তাদের শাখা তৃণমূল শাসনকালে কয়েকগুণ বেড়েছে। মুর্শিদাবাদে বামপন্থী হিন্দুদের ওপর আক্রমনের ফলে হিন্দুত্ববাদীরা নতুন করে অক্সিজেন পেয়ে গেছে। আশঙ্কা হয় বর্তমান শাসকদলের অবিমৃশ্যকারী আচরণের ফলে হিন্দুত্ববাদীরা বাংলাদেশের মৌলবাদীদের মত হঠাৎ করে ক্ষমতা দখল করবে না তো। ভুলে গেলে চলবে না দিল্লীতে একটা হিন্দুত্ববাদী দল গত ১১ বছর কায়েম রয়েছে ও দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও স্বয়ংশাসিত সংস্থাগুলি দখল করে দেশের গণতন্ত্র শেষ করে দিয়েছে।

জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার অবস্থান

সুশান্ত দাসগুপ্ত

ভারতীয় জনতা পার্টি গত ২৬ জুন দেশজুড়ে 'সংবিধান হত্যা দিবস' পালনের ডাক দিয়েছিল ৫০ বছর আগে ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন রাষ্ট্রপতি ফকরুদদীন আলি আহমদ, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির পরামর্শে সংবিধানের ৩৫২ ধারা মোতাবেক অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। সমস্ত দক্ষিণপন্থী , কিছু মধ্য ও বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে রাজ্য বিধানসভাগুলি ভেঙে দেওয়া, ইন্দিরা গান্ধির পদত্যাগ ও পুলিশ/ সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহের ডাক দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের ৩৫২ ধারার ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর ৫০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি পরাস্ত হন। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার সামগ্রীক প্রেক্ষাপট , কী ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি , সেই বিষয়ে এই নিবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারতের সহায়তা প্রদান, ১ কোটি শরণার্থীর ত্রাণের ব্যবস্থা ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের বিপুল ব্যয় ভারতীয় অর্থনীতির ওপর প্রভূত চাপ সৃষ্টি করেছিল। এর সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এবং কৃষির দ্রুত উন্নতিকল্পে বিশাল পরিমাণ অর্থ ঋণ দেওয়া হয়। বাজারে টাকার সঞ্চালন বাড়ায়। মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায় এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭২-এর নির্বাচনে কংগ্রেস প্রায় সব রাজ্যেই (তামিলনাড়ু ব্যতীত, এখানে কংগ্রেসের তৎকালীন জোটসঙ্গী এআইএডিএমকে জয়লাভ করে) বিপুলভাবে জিতে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই সঙ্গে প্রশাসনে দুর্নীতির অভিযোগও উঠতে থাকে। ইন্দিরা গান্ধি এই সময়ে শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দিয়ে কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেন। একইভাবে নাগাল্যান্ডেও বিদ্রোহী, নাগা নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একাংশকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে শান্তি স্থাপিত হয়।

গুজরাত

কিন্তু এতদসত্ত্বেও ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে অশান্তি শুরু হয়। গুজরাতে চিমনভাই প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে মূলত দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। প্রাথমিক ভাবে এই ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় সিপিআই প্রভাবিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন (AISF)। এর সাধারণ সম্পাদক অশোক পাঞ্জাবি তখন গুজরাতে তুমুল সর্বপ্রিয় ছাত্রনেতা। কিন্তু পরবর্তীতে এই ছাত্র আন্দোলনে আরএসএস প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদও (ABVP) যোগ দেয় এবং ক্রমশ নেতৃত্ব তাদের হাতে চলে যায়। জনসংঘের (আরএসএস-এর রাজনৈতিক সংগঠন) সারা রাজ্যব্যাপী বিস্তৃত সংগঠন থাকায় ABVP'র সুবিধা হয়। অপরদিকে দল হিসাবে সিপিআই গুজরাতে খুবই দুর্বল ছিল।

১৯৭০ সালে আমেদাবাদসহ গুজরাতে ভয়াবহ দাঙ্গার ফলে মেরুকরণের রাজনীতি করে ততদিনে জনসংঘ গুজরাতে শক্ত ভিত গড়ে তুলেছিল। রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করার দাবিতে ছাত্ররা 'নবনির্মাণ' আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন ক্রমশ হিংস্র হয়ে ওঠে। চিমন ভাই প্যাটেল তখন গুজরাতে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষরূপে একটি স্বীকৃত নাম। অবশেষে তিনি ১৯৭৪ সালে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়। ১৯৭৫ এর জুনে গুজরাত বিধানসভার উপ নির্বাচনে বিরোধীদের জোট জয়ী হয়। আদি কংগ্রেসের বাবুভাই প্যাটেল জনসঙ্ঘের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু ইতিহাসের কী পরিহাস, এই চিমনভাই প্যাটেল পরবর্তী সময়ে বিরোধীপক্ষে যোগ দিয়ে তাঁদের সমর্থনে জনতা দল সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেন। তখন আর কেউ দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন নি।

বিহার

বিহারে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রথম শুরু করে সিপিআই ও তার ছাত্র সংগঠন। তারা একটি সম্মিলিত জোট তৈরি করেছিল। ওই রাজ্যে তখন সিপিআই একটি শক্তিশালী গণভিত্তিসম্পন্ন দল। যে জোট তারা গঠন করে, তার নামটি বেশ দীর্ঘ-- ' বিহার রাজ্য মাহাঙ্গি অভাব পেশ কর বিরোধ মজদুর স্বসংঘর্ষ সমিতি।' ১৯৭৩ সালের শেষ দিক থেকেই তারা বিহারে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। তাদের স্লোগান ছিল 'পুরা রেশন পুরা কাম, নহি তো হোগা চাক্কা জ্যাম'।

কমিউনিস্টদের প্রতিবাদ আন্দোলনের সাফল্য দেখে তাদের সঙ্গে এখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল সেই জনসংঘের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। এদের সঙ্গে যোগ দিল সোশ্যালিস্টদের ছাত্র সংগঠন। তারা 'ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি' (CSS) নামে একটি মোর্চা গড়ে তুলল। এদের সংগঠন দ্রুত বিস্তার লাভ করে। স্কুল-কলেজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। লেখাপড়া কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। দাবি ওঠে, সরকারকে বরখাস্ত করতে হবে। ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ এরা পাটনা অভিযানের ডাক দেয়। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বেশ কিছু সরকারি ভবন ও দুটি সংবাদপত্রের দপ্তরে আগুন লাগানো হয়। পুলিশ গুলি চালায়। তিনজন ছাত্র নিহত হয়। তখন বিহারের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আবদুল গফফর। তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগত দুর্নীতির কোনও অভিযোগ ছিল না। তাঁকেও বরখাস্ত করার দাবি ওঠে। এই কংগ্রেস নেতাও পরে জনতা দলে যোগ দিয়েছিলেন।

এই অকমিউনিস্ট ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি এই অবস্থায় জয়প্রকাশ নারায়ণের (জেপি) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দেবার জন্য অনুরোধ জানায়। সক্রিয় দলভিত্তিক রাজনীতি থেকে দূরে থাকা জয়প্রকাশ ছাত্রদের বলেন যে তিনি এই ভ্রষ্টাচার দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। তবে দুটি শর্তে তিনি এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে রাজি আছেন। এক) এই আন্দোলনকে পুরোপুরি অহিংস থাকতে হবে। দুই) এই আন্দোলনকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। ছাত্ররা তাঁর দেওয়া এই শর্ত মেনে নেয়।

সারা দেশজুড়েই পর্যাক্রমে রাজ্য সরকার গুলি কে বরখাস্ত করার দাবিতে জয়প্রকাশ নারায়ণ সারা দেশে রাজনৈতিক সফর শুরু করেন। তিনি বিরোধী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার লাগাতর প্রয়াস চালান। কিন্তু অচিরেই গোটা হিন্দি বলয়ে তাঁকে সামনে রেখে আর এস এস ও

তাদের শাখা সংগঠনগুলি প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আর এস এস আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে পাটনায় এক বিশাল মিছিলে জেপি ঘোষণা করেন যে 'গান্ধিজি বলেছিলেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আনতে হবে। আর আজ আমি বলছি যে এক বছরের মধ্যে প্রকৃত জনশাসন আনতে হবে। এক বছরের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার উদয় হবে। নতুন এক দেশ। নতুন এক বিহার গড়বার জন্য একটা বছর তোমরা দাও জ্জ' এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই তিনি বিহারের বিপুল সাড়া পেলেন। বিহার ছাড়িয়ে অন্যান্য রাজ্যেও তা বিস্তৃত ছিল। তিনি সিপিআই বাদে সমস্ত বিরোধী দলকে নিয়ে সম্মেলন করলেন। প্রথম থেকেই জনসংঘের ছাত্র শাখা এবিভিপি জেপি'র আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। এবার আর এস এস ও জনসংঘের বয়স্ক কর্মীরাও এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করল।

জেপি'র আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকজন গান্ধিবাদীর বক্তব্য

জেপি'র এক গান্ধিবাদী সহকর্মী আচার্য রামমূর্তি সমস্ত ঘটনার অগ্রগতি লক্ষ্য করে আতঙ্কিত হয়ে জেপিকে এক চিঠিতে লেখেন 'আন্দোলনের নেতৃত্ব জনসংঘের হাতে চলে যাচ্ছে, অন্তত স্থানীয় স্তরে তো বটেই।' তিনি গভীর চিন্তিত হয়ে একথাও লেখেন যে 'সাধারণ মানুষকে আমাদের এই আন্দোলনের কর্মধারা ও মূল্যবোধে এখনও দীক্ষিত করা যায়নি। সাধারণ মানুষের কাছে এই আন্দোলন যত না গঠনমূলক কারণে, তার থেকে নেতিবাচক কারণেই আবেদন করছে বেশি' (আচার্য রামমূর্তি ও জেপির পত্র বিনিময়। গান্ধি উত্তর ভারত-রামচন্দ্র গুহ, পৃষ্ঠা-৪৩৩, আনন্দপাবলিশার্স)।

জেপি, প্রাক্তন আইসিএস আর কে পাতিল , যিনি মহারাষ্ট্রে গঠনমূলক কাজ করে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, তাঁকে বিহারে আমন্ত্রণ জানান। তিনি দুই সপ্তাহ ধরে সারা বিহারে ঘুরে বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে ৪ অক্টোবর, ১৯৭৪ জেপিকে এক চিঠিতে লেখেন যে এই আন্দোলন মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। বিশাল জনসাধারণ গভীর মনোযোগ সহকারে যেভাবে, আপনার বক্তব্য শুনছে তা অভূতপূর্ব। তবে এই জনসাধারণই যখন নিজরূপ ধারণ করে তখন তা অহিংস থাকে না। খাঁটি গান্ধিবাদের সঙ্গে এই আন্দোলনে যেসব পথ অনুসরণ করা হচ্ছে তার কোনও সম্পর্ক আছে কি না তাই নিয়ে শ্রী পাতিল প্রশ্ন তোলেন। তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, 'আমাদের মতন অনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রে সত্যাগ্রহ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সুযোগ কতটা...?' তিনি বলেন, 'যথাবিহিতভাবে নির্বাচিত একটি সরকারকে বরখাস্ত করার দাবি করে বিহার আন্দোলন নিজেকে অ-সাংবিধানিক ও অ-গণতান্ত্রিক বলে প্রমাণ করেছে।' উপসংহারে পাতিল লেখেন তিনি, 'ইন্দিরা গান্ধি সরকারের প্রকট ত্রুটিগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।' কিন্তু তা সত্ত্বেও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের শাসনের বদলে রাস্তার লোকের মতামতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের শাসন চালু করাটা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। পাতিল জেপিকে একথাও লেখেন যে 'আজ আপনি শুভশক্তির পক্ষেই রয়েছেন, কিন্তু ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে রাস্তার জনতা বোবস্পিয়ারের জন্ম দেয়। আজ সেই কারণেই বিহার ধরনের আন্দোলনের প্রতি আমার একটি সহজাত বিরূপতা রয়েছে (সমগ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৪)।

ইন্দিরা-জেপি পত্র বিনিময় ও সাক্ষাৎকার

১৯৭৪-এর ২২ মে ইন্দিরা গান্ধি জয়প্রকাশ নারায়ণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি আশা প্রকাশ করেন, দুই পরিবারের মধ্যে বহুকাল ধরে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের রাজনৈতিক মতভেদ থাকা সত্ত্বেও 'ব্যক্তিগত তিক্ততা ব্যাতিরেকে কিংবা পরস্পরের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন না তুলেই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।' এই চিঠিপত্র আদান-প্রদান শুরু হল খুবই শান্তভাবে, নমনীয়তা বজায় রেখে। কিন্তু তা শেষ হল তিক্ততার সঙ্গে। ইন্দিরার চিঠি পেয়েই জেপি উত্তর দেন। তাতে তিনি লেখেন, ইন্দিরা খলতার আশ্রয় নিচ্ছেন, কেননা তিনি সম্প্রতি ভুবনেশ্বরে এক জনসভায় ভাষণে বলেছেন যে, 'জেপি বড়লোকদের সঙ্গে ওঠাবসা করছেন ও পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ীদের বিলাসবহুল অতিথিশালায় থাকছেন।' জেপি লেখেন এই সব মন্তব্যতে তিনি 'আহত ও ক্রুদ্ধ। তিনি আরও বলেন যে ইন্দিরা শুধু তাকেই ভুল বুঝছেন তা নয়, তিনি তলা থেকে উঠে আসা এই উত্তাল তরঙ্গের তাৎপর্য কী তাও ধরতে পারছেন না ---যার পরিণতি অতি শোকাবহ হবে।

ইন্দিরা গান্ধি আত্মপক্ষ সমর্থন করে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন জ্জ তিনি লিখলেন যে অনেক নেতার দুর্নীতি নিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে 'আমি আপনার নাম উচ্চারণ করিনি বা এমন কিছু বলিনি যা আপনার মর্যাদা হানিকর। কিন্তু খবরের কাগজগুলি যদি তাদের মতন করে ব্যাখ্যা করে তাহলে আমি অসহায়।' ইন্দিরা গান্ধি একথাও বলেন যে জয়প্রকাশজি সৎ মানুষ। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা সবাই তা নয়। তাই তাঁর কোনও কোনও ধ্যানধারণা 'আমার কাছে বেশ স্বর্গীয় কল্পনা বলে মনে হয়। দেশের প্রত্যেকটি মানুষই যদি একজন করে জয়প্রকাশ নারায়ণ হয়ে যায়, একমাত্র তা হলেও ওগুলো কাজে লাগবে।' শ্রীনারায়ণই যে দেশের একমাত্র নীতিনিষ্ঠ ও বিবেকবান এই কথারও ইন্দিরা বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'আমি অতীব বিনয়ের সাঙ্গে আপনাকে জানাতে চাই যে আরও অনেকে দেশ নিয়ে, জনগণের মঙ্গল নিয়ে, জনজীবন থেকে ভ্রষ্টাচার আর দুর্বলতা দূর করা নিয়ে সমানভাবে ভাবিত। আর তাঁরা সকলেই হয়তো আপনার

অনুগামী নয়।' কিন্তু এই চিঠিপত্র বিনিময় শুরু হওয়ার দেড় মাস পর একটি চিঠি লিখে জয়প্রকাশ নারায়ণ জানালেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে ইন্দিরা ভুবনেশ্বরে ওই বক্তৃতায় তার চরিত্র ও সততা নিয়ে কোন কটাক্ষ করেননি তা প্রকাশ্যে স্বীকার করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। জয়প্রকাশ চিঠিতে লেখেন 'আমি একজন নিভৃতচারী নাগরিক। কিন্তু আমার আত্মসম্মানবোধ আছে।' তিনি লিখলেন যে এই পত্র বিনিময় আমাদের ভুল বোঝাবুঝি বাড়িয়েই তুলছে, কমাচ্ছে না।' ফলে পত্র বিনিময়ের সমাপ্তি ঘটল।

জয়প্রকাশ নারায়ণ আবার আন্দোলনে ফিরে গেলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একটি সমাধানসূত্রে পৌঁছনোর জন্য অন্যান্যদের চেষ্টায় ১৯৭৪-এর ১ নভেম্বর ইন্দিরার সঙ্গে জেপি'র এক দীর্ঘ বৈঠক হল। ইন্দিরা গান্ধি বললেন যে তিনি বিহার মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে রাজি আছেন তবে জেপিকে অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেবার দাবি তুলে নিতে হবে। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব জেপি প্রত্যাখ্যান করলেন। নির্বাচিত সরকারগুলিকে বরখাস্ত ও বিধানসভাগুলি ভেঙে দেবার দাবি তিনি ছাড়লেন না। বৈঠকে তীব্র মতপার্থক্য হলেও তা শেষ হল এক আবেগের সুরে। ইন্দিরার মা কমলা নেহরুর জেপির সদ্যপ্রয়াত পত্নী প্রভাবতীদেবীকে লেখা চিঠিগুলি ও কমলাকে লেখা প্রভাবতীর কিছু চিঠি জেপি ইন্দিরার হাতে. এদিন তুলে দেন জ্জ তিনি বলেন এগুলি তিনি ইন্দিরার কাছে থাকাই সমীচীন মনে করেন ।

জেপির আন্দোলন সিপিআই ও সিপিআই (এম)

জয়প্রকাশ নারায়ণ বিহারে তাঁর আন্দোলনে সিপিআই ও সিপিআই(এম)-কে শামিল করতে পারেননি। এই দুই দলের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন জেপির আন্দোলনে যোগ দেয়নি। এর কারণ শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন সম্পর্কে জেপি কোনও আগ্রহও দেখাননি। সিপিআই-এর বিহারে শক্তিশালী গণভিত্তি তৈরি হয়েছিল। এই দল জেপির আন্দোলনের বিরোধিতা করে। তাদের বক্তব্য ছিল নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও সমালোচনা হতে পারে। কিন্তু তার জন্য সরকার ভেঙে দেওয়া ও বিধানসভা বাতিল করার দাবি অগণতান্ত্রিক

সিপিআই-এর বক্তব্য ছিল 'ফ্যাসিস্ত ও সাম্প্রদায়িক শক্তি নির্বাচিত বিধানসভা ধ্বংস করে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে বানচাল করে দেশে সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি করতে চাইছে।' দল আরও বলে , এই আন্দোলনের পিছনে দেশের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লবের শক্তির পূর্ণ সমর্থন আছে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিরপেক্ষ নয়। ১৯৭৪-এর ৩ জুন এই দলের আহ্বানে পাটনায় এক বিশাল সমাবেশ হয়। মিছিলে শ্রমিক, শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষ, কৃষক, ছাত্র, সরকারি কর্মচারীরা ব্যাপক সংখ্যায় যোগ দেয়। রাজ্যপালকে একটি দাবি সনদ পেশ করে মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কালোবাজারি, মজুতদারি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পাইকারি ব্যবসা জাতীয়করণ প্রভৃতি বিষয়ে পার্টির বক্তব্য জানানো হয়। নির্বাচিত বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জেপির দাবিও বিরোধিতা করা হয়। সিপিআই এই সময় মতন দেশজুড়েই সংসদীয় গণতন্ত্রকে আক্রমণ ও বানচাল করার যে প্রচেষ্টা চলছে তার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে।

১১ নভেম্বর পাটনায় বিশ্ব ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন উপলক্ষে সিপিআই আবারও একটি বিশাল গণসমাবেশ সংগঠিত করে। এই সম্মেলনে বিশ্ব শান্তি পরিষদের আহ্বানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল। সিপিআই মনে করত ইন্দিরা গান্ধির প্রতি 'ঐক্য ও গণসংগ্রামের' রণকৌশল গ্রহণ করে তারা দেশকে বাম দিকে নিয়ে যেতে পারবে। পার্টির গণভিত্তি ও গণজমায়েতের ক্ষমতা ওই সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

সিপিআই (এম) এই সময় জেপির আন্দোলন সম্পর্কে কী ভূমিকা গ্রহণ করা হবে তাই নিয়ে বিভক্ত ছিল। হিন্দি বলয়ে এই দল, তাদের ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণসংগঠন জেপির আন্দোলনে যোগ দেয়নি। এই আন্দোলন সম্পর্কে তাদের অবস্থান ছিল দুর্বোধ্য। পশ্চিমবঙ্গে এই দল কংগ্রেসের আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছিল। তারা যদিও জেপির সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হয় যে ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর দল সেমি ফ্যাসিস্ত ও সমস্ত প্রতিক্রিয়ার উৎসমুখ। জেপির আন্দোলনে যোগ না দিয়েও এই দল বিহার বিধানসভা বাতিল ও মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার দাবিকে সমর্থন করে। তারা জেপির কাছে সুনির্দিষ্ট ও বিকল্প অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি উপস্থিত করার অনুরোধ জানায় যার ভিত্তিতে জনসাধারণকে সংগঠিত করা যাবে। তারা জেপিকে জনসংঘ ও দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য অনুরোধ করে। যদিও জেপি তাঁদের এই অনুরোধ রক্ষা করেননি। অপরদিকে সিপিআই(এম), কংগ্রেসকে সমর্থন করার জন্য সিপিআই-এর তীব্র সমালোচনা করে। যদিও কিছু সময় পরে সিপিআই (এম) সিদ্ধান্ত নিয়ে জেপির ১৯৭৪-এর ৫ জুন, ৩ থেকে ৫ অক্টোবর, ৪ নভেম্বর এবং ১৯৭৫-এর ৬ মার্চ এর কর্মসূচিগুলিতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। যদিও জেপি ও অধ্যাপক মধু দণ্ডাভাতের সঙ্গে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া ও পলিটব্যুরোর সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪-এ ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রেখে চলবেন। সিপিআই(এম) যদিও জনসংঘ ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী শক্তির এই আন্দোলনে, অংশ নেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু তারা মনে করত এর ফলে দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদের আগমনের মতন কোনও বিপদ নেই।

(ক্রমশ)

দেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার আগে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান যুক্তিবাদী মানুষেরা গর্জে উঠুন

তসলিমা নাসরিন

আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। একাত্তরে আমার পরিবারের লোক মুক্তিযুদ্ধ করেছে, আমার পরিবার পাকিস্তানি আর্মি দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। আমি বাহাত্তরের সংবিধানে আস্থা রাখি। আমি শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বলে মানি। ধর্মনিরপেক্ষতায়, গণতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, মানবাধিকারে, এবং নারীর সমানাধিকারে আমি বিশ্বাস করি। আমি যতটা দেশকে ভালবাসি, আমি নিশ্চিত, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাসদ, সিপিবি, জাতীয় পার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ সদস্যই ততটা ভালবাসে না। দেশকে ভালবাসি বলেই দেশের মানুষকে সভ্য শিক্ষিত এবং সচেতন করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, নারীর সমানাধিকারের পক্ষে আমি লেখালেখি করেছি। বই প্রকাশ করেছি। কিন্তু ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, নারীবিদ্বেষী অপশক্তি আমাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিল নব্বই দশকের শুরুতে, আমার পাশে তখন কোনও সরকার তো দাঁড়াননি, বরং উল্টে আমার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার মামলা করে আমাকে চিরকালের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন। এরপর না খালেদা জিয়া আমাকে দেশে ফিরতে দিয়েছেন, না হাসিনা দিয়েছেন। খালেদা, হাসিনা দুজনই মানবতার পক্ষে লেখা আমার বইও নিষিদ্ধ করেছেন।

গত জুলাইয়ে আমি কোটা বিরোধী আন্দোলনের সমালোচনা করেছি, কারণ আমি নারীকোটার পক্ষে। আমি চেয়েছি হাসিনা পদত্যাগ করুন, নতুন নির্বাচন দিন। কিন্তু দেশ থেকে তাঁকে বের করে দেওয়ার পক্ষপাতী আমি ছিলাম না। আমি কোনও দল করি না, কোনও দল ভাল করলে তার ভাল বলি, খারাপ করলে তার খারাপ বলি। তবে ধর্মভিত্তিক যে কোনও দলের আমি বিরোধী। আমি মত প্রকাশের অধিকারে বিশ্বাসী হয়েও ধর্মের রাজনীতির ঘোর বিরোধী। জামায়াতে ইসলামিকে কোনও রাজনৈতিক দল হিসেবে আমি মানি না। ধর্ম আর রাজনীতি বা ধর্ম আর রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ পৃথক করা সভ্যতার প্রথম শর্ত বলে আমি বিশ্বাস করি।

হাসিনার অসংখ্য ভাল কাজের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু তারঁ কিছু খারাপ কাজের সমালোচনা করি। খারাপ কাজের মধ্যে আছে ওলামা লীগ গঠন করা, হেফাজতে ইসলামিকে মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য জমি আর অর্থদান করা, ৫৬০ মডেল মসজিদ বানানো, কওমী মাদ্রাসা গড়া, মাদ্রাসার ডিগ্রি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে সমমানের করা, সিলেবাসের ইসলামীকরণ করা, নারীবিদ্বেষী-হিন্দুবিদ্বেষী জি হাদিদের ওয়াজ মাহফিল করার অনুমতি দেওয়া, সংখ্যালঘু হিন্দু বৌদ্ধদের যথেষ্ট নিরাপত্তা না দেওয়া, সম্পূর্ণ বাকস্বাধীনতা এবং প্রেসফ্রিডম না দেওয়া, হাজার কোটি টাকা লুট করে যে আওয়ামী দুর্নীতিবাজরা পালাচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া, সুষ্ঠু নির্বাচন না দেওয়া ইত্যাদি। আওয়ামী লীগের মধ্যে এমন প্রচুর লোক ছিল যারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য লীগে যোগ দিয়েছিল, অবশ্যই আমি তাদের বিরোধী। আমি ধিক্কার জানাই সেই আওয়ামী লীগারদের, যারা দেশে থাকা সত্ত্বেও ছুটে এসে জি হাদিদের হাত থেকে রক্ষা করেনি শেখ মুজিবের ভাস্কর্য, যখন ভাস্কর্যের মাথায় উঠে জি হাদিরা প্রস্রাব করছিল, আর শাবল কুড়োল দিয়ে শুধু একটি নয়, তাঁর সবগুলো ভাস্কর্য ভেঙে ছিল, রক্ষা করেনি শেখ মুজিবের বাড়ি, যখন বুলডোজার এনে বাড়িটি গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল, রক্ষা করেনি মুজিব নগরের স্মৃতিসৌধ, স্বাধীনতা জাদুঘর।

যে আওয়ামী লীগাররা এখন জুলাই আন্দোলনে ছিল না বলে গর্ব করছে আর হাসিনার পদত্যাগ বা পতন যারা চেয়েছিল, তাদের নানা ভাবে হেনস্থা করছে, বলতে চাইছে যে হাসিনার পতন হয়েছিল বলে জি হাদি সরকার এসেছে ক্ষমতায়, তাদের বলতে চাই যে, হাসিনা অতি মাত্রায় জি হাদি তৈরিতে সাহায্য করেছিল বলেই জি হাদিতে দেশ ভরে গেছে। আর জি হাদিরা যত ইসলামে বিশ্বাস করেছে, তত নারীবিদ্বেষী হয়েছে, যত নারীবিদ্বেষী হয়েছে তত বিশ্বাস করেছে নারী নেতৃত্ব হারাম। দেশ ইসলামে ভরপুর হয়ে উঠলে নারী আর নেত্রী হতে পারে না, নারীকে ঘরে ফিরে যেতে হয়, ফিরে গিয়ে স্বামী এবং সন্তান- সেবায় ব্যস্ত হতে হয়, ঘর থেকে দু'পা বেরোলে বোরখা নিকাব পরে বেরোতে হয়। শিক্ষা, সচেতনতা আর স্বনির্ভরতাও নারীর জন্য হারাম হয়ে ওঠে। হাসিনা দূরদর্শী ছিলেন না, তাই ইসলামকে কোলের ওপর বসিয়েছিলেন, কওমী মাতা সেজেছিলেন। হাসিনা-পতনের আন্দোলনের নেপথ্য নায়করা সবাই ছিল হাসিনার সাহায্য-সহযোগিতায় গড়ে ওঠা মাদ্রাসা থেকে পয়দা হওয়া জঙ্গি। ইউনুস এই জঙ্গিদের সর্দার হয়েছেন, কিন্তু এই জ ঙ্গিদের পয়দা তিনি করেননি।

এখন যে আওয়ামী লীগাররা ভাবছে, ইউনুসকে হঠিয়ে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনবে, তারাই হাসিনার পদত্যাগ যারা চেয়েছিল তাদের সবচেয়ে বেশি হেনস্থা করছে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেছে ইউনুস সরকার। জামায়াতে ইসলামী ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। আগামী নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ জেতে, আমি খুশি হব। তবে

ভোটে জিতে আসা চাই। বছরের পর বছর ক্ষমতার জোরে বিনা নির্বাচনে ক্ষমতায় থাকা কোনও ভাবেই ভাল কাজ নয়। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নির্বাচনে যেতে ভয় তো লাগবেই। জনগণ থেকে কোনও নেতা নেত্রী যেন বিচ্ছিন্ন না হন। একবার ক্ষমতা হাতে পেলে অনন্ত কাল ক্ষমতায় থাকার স্বপ্নে যেন কেউ বিভোর না থাকেন।

আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীকে যেভাবে ইউনুসের জ ঙ্গি বাহিনী নির্যাতন করছে, খুন করছে, জেলে ভরছে, পেটাচ্ছে ,-তার প্রতিবাদ, আমি, দেশে আজ তিরিশ বছর নেই, কোনওদিন ফিরতেও কেউ দেবে না আমাকে, জেনেও, সামান্যতম স্বার্থ নেই আমার, বুঝেও, আওয়ামী লীগের লোক না হয়েও যেভাবে করেছি, সেভাবে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ সদস্যই করেনি। ইউনুস সরকারের যত তীব্র সমালোচনা আমি করছি, তত তীব্র সমালোচনা অধিকাংশ আওয়ামী লীগারকে করতে দেখছি না। তাদের অনেকেই ওত পেতে আছে কখন বিক্ষোভ,প্রতিবাদ, আর সমালোচনায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে এই সরকার বিদেয় নেবে আর হাসিনা ফিরে আসবেন, আর তখনই চলবে তাদের লুটপাট,বিদেশে পালানো, হিন্দুর জমি দখল, দেশ জুড়ে জি হাদি জ ঙ্গি তৈরির কারখানা মসজিদ মাদ্রাসা বানানো। আমি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নই। আমি মনে করি আওয়ামী লীগকে শুদ্ধ হতে হবে, সৎ হতে হবে,দেশকে ভালবাসতে হবে, ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যে রাখতে হবে, রাষ্ট্র এবং সমাজকে ধর্ম থেকে মুক্ত করা শিখতে হবে। একটা সময় তো এমন হয়েছে, কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, সত্য এই যে, জামায়াতে ইসলামি বা হেফাজতে ইসলামির সঙ্গে আওয়ামী লীগের আদর্শগত কোনও পার্থক্য ছিল না।

আওয়ামী নেতাদের চেয়ে এখন বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানই বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা বেশি জানাচ্ছেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনিই বেশি আপসহীন বক্তব্য রাখছেন, তিনিই ইউনুস সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। আসলে দল দেখলে এখন চলবে না। কোনও দলেরই কোনও আদর্শ আর নেই। স্বার্থের জন্য সব আদর্শ বিকিয়ে দিয়েছে সবাই। দল এবং দলের বাইরে কিছু শুধু মানুষ আছে এখনও খাঁটি, এখনও নিঃস্বার্থ। এই মানুষগুলো এক হোক, জোট বাঁধুক। দেশের এই দুরবস্থায় তাদেরই বেশি প্রয়োজন। দলান্ধ, আর স্বার্থান্ধে দেশ ছেয়ে গেছে। এখন হায়েনার মতো হিংস্র জি হাদিরা দেশকে চিবিয়ে খাচ্ছে। দেশ এবং দশের ভাল এই খিলাফতিরা কোনওদিন চায়নি। দেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে একবার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান যুক্তিবাদী মানুষেরা গর্জে উঠুক।

আঁধার রাতে মশাল নিশান

অপর্ণা

(২৯ শে জুন ২০২৪ এ প্রকাশিত 'তহমীনা খাতুন এক আগুন পাখি' স্মারক গ্রন্থে মুদ্রিত)

তহমীনা খাতুনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। পারিবারিক পরিমন্ডলে বহুবার শুনেছি তাঁর কথা। ছোটোবেলায় স্কুলে ভর্তির সময় ফর্ম ফিল আপে দেখেছি মা ধর্মের খোপটি ফাঁকা রেখেছেন, বাড়িতে ধর্মীয় পরিমন্ডল দেখিনি। সব কিছুকে আধ্যাত্মিকতার কুঠুরি থেকে বের করে এনে যুক্তি-বুদ্ধি ও বিজ্ঞান দিয়ে ভাবতে শিখেছি মা বাবার থেকেই! একটু বড়ো হওয়ার পর শুনেছি তহমীনা খাতুনের গল্প। যতো দিন গেছে উপলব্ধি করেছি তাঁর লড়াইয়ের ব্যাপকতাকে। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের সঙ্গেই জীবনের এই বাইশটি বছরে সাক্ষাৎ হয়েছে, সান্নিধ্য পেয়েছি। আশা ছিল দুস্তর প্রান্তরে একাকিনী লড়াই চালানো মানুষটির সঙ্গেও দেখা হবে একদিন...

ইতিহাস ভালোলাগার সূত্রে ২০১৮ সাল নাগাদ চন্দ্রকেতুগড় গিয়েছিলাম। তখন জেনেছিলাম এম এ জব্বার সাহেবের কথা। জেনেছিলাম চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণের সাথেও জড়িয়ে আছে তহমীনা খাতুনের নাম জব্বার সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী হওয়ার সুবাদে তিনিও আগলে রেখেছিলেন ইতিহাসের আকরিকদের।

বাড়িতে ছোটবেলা থেকেই হারিয়ে যাওয়া নদী সোনাই সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি। শুনেছি সেই হারিয়ে যাওয়া নদীর অতীত গৌরবের কথা, ইংরেজ আমল থেকে তার বিরুদ্ধে চলা ষড়যন্ত্রের কথা, এবং ধীরে ধীরে একটি ফল্গু নদীর মৃত্যুর কাহিনি! সোনাই নদী বাঁচানোর দাবিতে চলা আন্দোলনগুলির ইতিবৃত্ত জানার মাঝেই শুনেছি সুকুমার মিত্রের কথা, তাঁর নদী বিষয়ক সমৃদ্ধ কাজের কথা। তখনই জেনেছি। সাংবাদিক ও নদী বিশেষজ্ঞ সুকুমার মিত্রের আরেক পরিচয়-তিনি তহমীনা খাতুনের সহযোদ্ধা এবং একসাথে তাঁদের অক্লান্ত লড়াই এক যুগোত্তীর্ণ সংগ্রাম!

যত বড়ো হয়েছি উপলব্ধি করেছি তহমীনা খাতুনের লড়াইয়ের শক্তিকে! ভাবার চেষ্টা করেছি, যদি আমার সঙ্গে অমন ঘটনা ঘটতো? যদি ধর্মের শূন্যস্থানে ঢ্যাড়া কেটে দেওয়ায় বি এড কলেজে ভর্তি আটকে যেত? যদি নিশ্চয়তার প্রশ্নচিহ্নর সামনে পড়তো ভবিষ্যৎ? তাহলে কি আমি বা আমরা পারতাম ওইভাবে সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে লড়াই চালাতে? তাঁরও হয়তো স্বপ্ন ছিল শিক্ষকতার পেশায় জ্ঞানের আলোক ছড়ানোর, বি এড সম্পূর্ণ করে বিদ্যালয় শিক্ষিকার ভূমিকা পালন করার... কিন্তু সেই ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার স্বার্থকে ভুলে বৃহত্তর স্বার্থে, সমাজ সংস্কারের জগদ্দল পাথরের বোঝা সরিয়ে

দেওয়ার লড়াই লড়তে কজন পারে? অনেকসময়ই লড়াই আর ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষ দ্বিতীয়টিকেই গুরুত্ব দিয়ে ফেলে! নিজেকে সুরক্ষিত রেখে প্রতিবাদে সামিল হতে অনেকেই পারেন, কিন্তু নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতকে বাজি রেখে যাঁরা সংগ্রামী হন, তাঁরা যে যুগোত্তীর্ণ!

আমাদের অতি লজ্জার বিষয় এই যে, একুশ শতকে দাঁড়িয়েও আমরা ধর্মের নাগপাশে বন্দী! যতদিন যাচ্ছে ধর্মের শৃঙ্খল যেন আরো মজবুত হচ্ছে, ধর্মকে হাতিয়ার করা শক্তির দাঁত নখ তীক্ষ্ণ হচ্ছে রোজ! এই অদ্ভুত আঁধারের যুগে দুজন না-ধার্মিক মানুষের একসাথে পথ চলা নিঃসন্দেহে আশা যোগায়, আলো আনে নিকষ কালোয়। ধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে না বোঝাতেই তো যৌক্তিক মননের সার্থকতা। যে ভারতবর্ষে ধর্মের জিগিরে স্থাপত্য ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় উন্মত্ত ধ্বজাধারী, সেদিনের সেই ভারতবর্ষে একসাথে পথ হাঁটা শুরু করেন দুজন মানুষ, সমাজ তাকে দাগিয়ে দেয় ভিন ধর্মে বিবাহের আখ্যায়! ধর্মের উগ্রতার বিপ্রতীপে তাঁরা গেয়ে চলেন মিলনের সুরে, লড়াই করেন মানুষের সুদিনের স্বপ্নে! তহমীনাদের স্বপ্নেরা নেভে না, তাই ৩২ বছর পরের ভারতবর্ষে যেদিন আবার লকলকিয়ে ওঠে ধর্মের বিষজিহ্বা, একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ভাঙা মসজিদের ওপর উদ্বোধন হয় কোটি কোটি টাকা ধ্বংস করা রামমন্দির, ঠিক তার পরের দিন (২৩ শে জানুয়ারি ২০২৪) নিজেকে 'মৃত্যু চেয়ে বড়ো' প্রমাণ করে না-ফেরার দেশে পাড়ি দেন তহমীনা-স্বপ্নদেরকে ছড়িয়ে দিয়ে যান তার পথে আলো জ্বেলে তার পথেই একদিন সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে পৌঁছে আমরা খুঁজে পাবো সুসভ্যতার আলোক...

রবিবার গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট হলে তহমীনা খাতুন জন্মদিবস পালনের কিছু ফ্রেমবন্দি মূহুর্ত। অনুষ্ঠানে তহমীনা খাতুন মরণোত্তর স্মারক সন্মান প্রদান করা হয় সাম্প্রতিক ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে প্রথম শহীদ ঝন্টু আলী শেখেকে। উপস্থিত ছিলেন শহীদ সেনার নদীয়া নিবাসী বাবা ও দাদা। এছাড়াও মরণোত্তর সন্মান প্রদান করা হয় মানবাধিকার কর্মী আত্মজিৎ চৌধুরীকে। স্মারক সন্মান দেওয়া হয় কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের কৃতী ছাত্র জজবুল সেখকে। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী জজবুলের মা ও বাবা নিরক্ষর, সেই পরিবারের সন্তান এই মেধাবী ছাত্র স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পাশাপাশি ইউজিসি নেট ও সেট পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্মারক সন্মান পান রোকেয়া গবেষক প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় সুকুমার মিত্রের বই 'সুভাষ নন, ওটেনকে মারেন অনঙ্গমোহন'। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভারত বিদ্বেষী অধ্যাপক ওটেনকে প্রহারের দায়ে নেতাজীকে বহিষ্কার করা হলেও বাস্তবে যিনি এই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন সেই বীর বিপ্লবী সিলেটের অনঙ্গমোহন দামকে বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে এনেছে এই গ্রন্থ। বইটি প্রকাশ করেন কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অসাধারণ একটি স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষয় - শিক্ষাব্রতী রোকেয়া ও বাঙালি মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রসার।

পুরনো লেখা ফিরে পড়া

কার্ল মার্কসের ধর্মচিন্তা

সোমেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকার ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা'য় লেখাটি প্রকাশিত হয়। তিন পর্বে সমাপ্য দীর্ঘ লেখাটির এবার অন্তিম পর্ব)

৩.

মার্কস ও এঙ্গেলস রোমক সাম্রাজ্যের পতনের সময় যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের ফলে খ্রীস্টধর্মের আবির্ভাব সেগুলির ঐতিহাসিক কারণ কী, তা পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ক্রীতদাস, সাধারণ দরিদ্র মানুষ ও দাসত্বে আবদ্ধ জাতিগুলির অসংখ্য বিদ্রোহের পর রোম যখন রক্তাপ্লুত তখন সাম্রাজ্যের সমস্ত মানুষের বর্তমান জীবন সম্বন্ধে হতাশা ও কাল্পনিক পরজগতে মুক্তির আশা খ্রীস্টধর্মের জন্ম দেয়। এবং প্রথম যারা এই ধর্মমত গ্রহণ করে তারা ছিল প্রধানত দাসত্বমুক্ত, দরিদ্র স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস। পরবর্তী যুগে এই ধর্মটি যে সরকারি চেহারায় পরিণত হয় সেটি হল তার রাষ্ট্রধর্মের চেহারা। এশিয়া মাইনরের নিকাই নগরে রোমের সম্রাট প্রথম কনস্টান্টিনের আদেশে আহূত তাঁর সাম্রাজ্যের খ্রীস্টান ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ও বিশপদের প্রথম বিশ্ব-সভায় খ্রীস্টধর্মকে এই চেহারা দেওয়া হয়। এই সভা সমস্ত খ্রীস্টানের পক্ষে বিশ্বাসের বাধ্যতামূলক কতকগুলি প্রতীক রচনা করে, যেগুলি অগ্রাহ্য করলে রাষ্ট্রীয় অপরাধ বলে গণ্য হতো। মধ্যযুগে যে পরিমাণে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটে, সেই পরিমাণেই তার ধর্মগত পরিপূরক হিসাবে, সামন্ততান্ত্রিক সোপানসহ, খ্রীস্টধর্মও বিকশিত হয়। এবং 'বার্গার'রা সজীব হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ক্যাথলিকবাদের বিরুদ্ধে প্রটেস্টান্ট ধর্মদ্রোহ বেড়ে ওঠে। আলবিগেঁসরা (১২শ ও ১৩শ শতকে দক্ষিণ ফ্রান্স ও উত্তর ইতালির শহরগুলিতে প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়) প্রথম ক্যাথলিকদের সাড়ম্বর উপাসনাপদ্ধতি ও গির্জার সোপানতন্ত্রের বিরোধিতা করে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নগরের ব্যবসায়ী কারুজীবীদের প্রতিবাদকে ধর্মগত রূপ দেয়। গির্জার ভূসম্পত্তি লোকায়তকরণের প্রচেষ্টায়

তাদের সঙ্গে অভিজাতদের একাংশ যোগ দেয়। এই জাতীয় আন্দোলন প্রমাণ করে যে, শিল্পবাণিজ্যের অগ্রগতির শক্তি, অর্থাৎ উন্নত উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক, পোপ বা গির্জার নির্দেশের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। কালক্রমে স্বাধীন চিন্তাশীলদের অধিকার ও প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম তার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। এবং ক্রমেই এই ধর্ম শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থায় যারা আধিপত্য করে তাদের অথবা শাসকশ্রেণীগুলির সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়; কেবলমাত্র শাসনের উপায় বা অস্ত্র হিসাবে, নিম্নতর শ্রেণীগুলিকে বন্ধনে রাখার উদ্দেশ্যে এ ধর্ম ব্যবহৃত হয়।

সমাজবিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে উন্নত ধরনের (অর্থাৎ বৈষয়িক অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে অনেক উচ্চ পর্যায়ের) যে ভাবাদর্শ ধর্মের রূপ গ্রহণ করে কালক্রমে তা নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ও শাসনের উপায়ে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে ধ্যানধারণার সঙ্গে বৈষয়িক অস্তিত্বের আন্তঃসম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে, এবং মধ্যবর্তী যোগসূত্রগুলির জন্য তাদের অস্পষ্টতাও বৃদ্ধি পায়। অথচ এই আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু ভাবাদর্শের সবকিছুই আবার যেহেতু সমাজের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে এসে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়, সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন এবং প্রতিবাদও ধর্মতত্ত্বমূলক রূপ গ্রহণ করে।

'খ্রিস্টের অনুকৃতিতেই ঈশ্বর আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তবু আমাদের উপর এমন পশুর মতো ব্যবহার করা হয় কেন?' এই প্রতিবাদ তুলেই সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ইংরাজ কৃষকরা বিদ্রোহ করে। এই প্রতিবাদেরই মর্মবাণী ধ্বনিত হয় লেভেলার, ডিগার ও লুডাইটদের বিদ্রোহে। এইসব বিদ্রোহ দমনও করা হয় ধর্মের নামে। ধর্ম একদিকে সনাতন সমাজব্যবস্থার অলঙ্ঘনীয়তা রক্ষার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয় 'ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর, যেন রাজার প্রতি ভক্তি রেখে, আইনের প্রতি আনুগত্য রেখে, পরস্পর দোসরপ্রতিম হয়ে, আমরা সকলে তোমার সেবা করতে পারি।' আবার অন্যদিকে, দুঃখভারাক্রান্ত নিপীড়িত শ্রেণীকে মৃত্যুংতীর্ণ জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখের কথা শুনিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হয় ধর্মেরই নামে 'এ কথা ভুলো না, এবং একথা বলেই পরস্পরকে সান্ত্বনা দিও যে, স্বর্গে তোমাদের জন্য স্থায়ী আনন্দের জীবন অপেক্ষা করছে।' এইভাবেই সমস্ত সামাজিক অবিচারকে ধর্মের নামাবলি পরিহিত একটি সুকুমার চেহারায় উপস্থিত করা হয়; আর সাধারণ মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখা হয় ধর্মীয় ভাবাদর্শের মোহে। 'ধর্ম মানুষকে আফিমের মত নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখে' বলে মার্কস এই কথাই বোঝাতে চান।

ধর্ম এক বিশেষ ধরনের সমাজসচেতনতা, শ্রেণীসমাজে উপরিতলের এক বিশেষ উপাদান। সামাজিক সম্পর্কের বিকাশের উপর, সমাজের শ্রেণীকাঠামোর উপর ধর্মের অস্তিত্ব। মার্কস ও এঙ্গেলস ধর্মের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখান যে, শোষকশ্রেণীর স্বার্থে, সাধারণ মানুষকে অন্ধ ও খর্ব করার উপায় বা অস্ত্র হিসাবে ধর্মের পরিপুষ্টি। এবং একথা বুঝতে কোনো গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না যে, মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজজীবনের প্রতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ধ্যানধারণা, মতামত ও বিশ্বাস, এককথায় তার চেতনা, পরিবর্তিত হয়। চিন্তার ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বৈষয়িক উৎপাদন পরিবর্তনের সঙ্গে আনুপাতিকভাবে মানসিক সৃষ্টির প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে। প্রতি যুগেই যে-সব ধারণা আধিপত্য করে তা মূলত ও প্রধানত সমসাময়িক শাসকশ্রেণীরই ধারণা। জমিদারের সঙ্গে পুরোহিত যেমন সর্বদাই হাত মিলিয়েছে, সামন্ত সমাজতন্ত্রের সঙ্গেও তেমনি ধর্মগত পরিপুরক হিসাবে এসে জুটেছে পাদরিদের সমাজতন্ত্র। প্রাচীন জগৎ যখন তার শেষ পাদে এসে পৌঁছায়, তখন প্রাচীন ধর্মব্যবস্থাও খ্রীস্টধর্মের কাছে পরাস্ত হয়। খ্রীস্টান ধারণা যখন অষ্টাদশ শতকে যুক্তিবাদী ধারণার কাছে পরাজিত হয় তখন সামন্তসমাজেরও সংগ্রাম চলে সেদিনের বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে। ধর্মমতের স্বাধীনতা, বিবেকের মুক্তি কেবলমাত্র জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার আধিপত্যকেই রূপ দেয়। ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ভাবাদর্শের পরিবর্তন হয়েছে, ধর্ম বিলুপ্ত হয়নি। মার্কসবাদ নতুন ভিত্তিতে ধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে, ধর্মের বিলোপ সাধনেরই পক্ষপাতী। এবং চিরপরিবর্তনশীল জগৎ ও সমাজে চিরন্তন সত্য বলে কিছু আছে একথাও অস্বীকার করে। সমস্ত অতীত সমাজের ইতিহাস শ্রেণী বিরোধের বিকাশমাত্র, বিভিন্ন যুগে এই বিরোধ বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। কিন্তু যে কোনো রূপেই এই বিরোধ প্রকাশিত হোক না কেন, একটা ব্যাপার সব যুগেই বর্তমান; যথা, সমাজের এক অংশ কর্তৃক আর এক অংশের শোষণ। সেজন্যই অতীতে সামাজিক চেতনায় বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও তা কয়েকটি নির্দিষ্ট সাধারণ ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে; শ্রেণীবিরোধের অবলুপ্তির পূর্বে তা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হতে পারে না।

নতুন ভাবাদর্শে পুরনো ভাবাদর্শের ঐতিহ্যগত যে-উপাদানটি থেকেই যায় মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজবিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, এই উপাদানের রূপান্তর শ্রেণী-সম্পর্ক তথা অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকেই আসে। কিন্তু বিভিন্ন পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভাবাদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি, একবার সংস্থাপিত হবার পর, অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তনের তুলনায় অনেক কম পরিবর্তনশীল থাকে; পরিবর্তন-প্রতিরোধক এক ক্ষমতার বলে প্রকৃত বৈষয়িক অবস্থার অনুপাতে ধর্মীয় উপাদানসহ সমগ্র উপরিতলই পিছনে পড়ে থাকে।

মার্কস ধর্মের অবসান চান, ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চান না। ধর্ম যে পরিমাণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রূপে বর্তমান, যে পরিমাণে

জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য শাসকশ্রেণীর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত, যে পরিমাণে বহিঃশক্তি সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ও অসহায়তার ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত, এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরোধিতা করেই তার স্থায়িত্ব, মার্কসবাদ সেই পরিমাণেই ধর্মবিরোধী। ধর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে ধর্মীয় অন্ধতা আরও দৃঢ় হবে, তাই মার্কস ধর্মের ক্রমশ অপসারণ চান। তাছাড়া, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সমাজের ভিত্তি হলেও, উপরিতলের বিভিন্ন বস্তু যথা, শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক রূপগুলি এবং তার ফলাফল; সংগ্রামের পর বিজয়ী শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংবিধানাদি, সংগ্রামে যোগদানকারীদের মনে বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন, রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক তত্ত্বাবলি, ধর্মীয় মতামত ইত্যাদি ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলির গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তাদের রূপ নির্ধারণে প্রধান হয়ে ওঠে। মার্কস বা এঙ্গেলস কখনো বলেননি যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারই 'একমাত্র' নির্ধারক বস্তু, তাঁদের মতে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে 'শেষপর্যন্ত' নির্ধারক বস্তু। মানবমনকে আচ্ছন্ন করে রাখে যে ঐতিহ্য ও ভাবাদর্শ তাও একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে, যদিও সে-ভূমিকা শেষপর্যন্ত আবশ্যিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, এবং নির্ধারকও নয়।

যে-কোনো প্রগতিশীল শ্রেণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ধর্ম ও ঈশ্বরে অনাস্থা। প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত ও ধর্মীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বস্তুবাদী নাস্তিকদের (যারা উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর আদর্শগত গুরু ছিলেন) ভূমিকা যেমন উল্লেখযোগ্য, বস্তুবাদী দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে নিরীশ্বরবাদ প্রচারের মূল্যও তেমনি অনস্বীকার্য। অবশ্য প্রগতিশীল বুর্জোয়াশ্রেণী যখন ক্ষমতা হাতে পায়, এবং বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েত শ্রেণীবিদ্বেষ আরও তীব্র রূপ ধারণ করে, তখন তারা সমস্ত মুক্ত চিন্তা পরিত্যাগ করে ধর্মকে সাধারণ মানুষের জন্য এক মাদকদ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। মার্কসবাদ প্রবর্তকরা তাঁদের প্রাক্তন বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদীদের অবদান অস্বীকার করেননি; কিন্তু তাঁরা এও দেখান যে, বুর্জোয়া নিরীশ্বরবাদের শ্রেণী সীমাবদ্ধতা, অসামঞ্জস্য ও আধাআধি মনোভাব, তার অনুধ্যান ও নিষ্ক্রিয়তা ধর্মের সামাজিক উৎস সন্ধানে সম্পূর্ণ অক্ষম। মার্কসের মতে, পূর্ববর্তী সমস্ত বস্তুবাদের ত্রুটি এই যে, তাতে বস্তু ও সংবেদ্যতাকে কেবল বিষয় বা ধ্যান রূপে ধরা হয়েছে, মানবিক সংবেদনগত ক্রিয়া হিসাবে, ব্যাবহারিক কর্ম হিসাবে দেখা হয়নি। ফলে, বস্তুবাদের বিপরীতে সক্রিয় দিকটি বিকশিত করেছে ভাববাদ, যেখানে মানবিক ক্রিয়া বস্তুগত ক্রিয়া হিসাবে ধরা পড়ে না, তাত্ত্বিক ক্রিয়াই খাঁটি মানবিক ক্রিয়া বলে গণ্য হয়। কিন্তু মার্কসীয় মতবাদ অনুসারে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মানুষকে তার চিন্তার সত্যতাকে অর্থাৎ ইহমুখিতাকে প্রমাণ করতে হবে। মানুষ পরিবেশ ও পরিপালনের ফল; কিন্তু পূর্ববর্তী বস্তুবাদী মতবাদ ভুলে যায় যে, মানুষই পরিবেশকে পরিবর্তিত করে এবং স্বয়ং পরিপালককেই পরিপালিত করা প্রয়োজন।

এতকাল মানুষ তার নিজের সম্পর্কে, সে কী এবং তার কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে, কতকগুলি মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করে এসেছে। ঈশ্বর এবং স্বাভাবিক মানুষ সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা অনুসারে সে এই সম্পর্কগুলিকে সাজিয়েছে। ক্রমেই স্ব-সৃষ্ট অলীক কল্পনা, অন্ধ সংস্কার ও কাল্পনিক সত্তার কাছে, অর্থাৎ চিন্তার শাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এই চিন্তার শাসন এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌছায় যার ফলে ইহলৌকিক ভিত্তিটাই নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক স্বাধীন এলাকা হিসাবে মেঘলোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। এই ঘটনার একমাত্র প্রকৃত ব্যাখ্যা এই ইহলৌকিক ভিত্তিটারই স্ববিভাগ ও স্ববিরোধিতা। বুর্জোয়া সমাজে মানুষ এক অনাত্মভাব বা আত্ম-বিযুক্তির দ্বারা পীড়িত। বিত্তবান ও নির্বিত্ত উভয় শ্রেণীই একই আত্ম-বিযুক্তির অংশভাক্। বিত্তবান শ্রেণী এই বিযুক্তির মধ্যে পায় আত্মস্বীকৃতি, আত্মকল্যাণ এবং এরই মধ্যে সে একটা মানবিক অস্তিত্বের আভাস পায়। আর নিবিত্তশ্রেণী এই আত্ম-বিযুক্তির মধ্যে অনুভব করে আত্মবিলুপ্তি, আত্মশক্তিহীনতা, এবং এক অমানবিক অস্তিত্বের বাস্তবতা। তাই মার্কস মনে করেন, প্রথমেই এই স্ববিরোধকে দূর করতে হবে, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে হবে। পবিত্র পরিবারের রহস্য পার্থিব পরিবারে আবিষ্কৃত হবার পর এই পাখিব পরিবারটিকেই ব্যাবহারিক বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী দার্শনিকরা জগৎকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, মার্কসের মতে তাকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সামাজিক জীবন মূলত ব্যাবহারিক। যেসব রহস্য তত্ত্বকে অতীন্দ্রিয়বাদের পথে বিভ্রান্ত করে সেগুলির সমাধান মেলে মানবিক ব্যাবহারিক কর্মের মধ্যে। ধর্মীয় অনুভূতি নিজেই একটা সামাজিক সৃষ্টি এবং ঈশ্বর নামে যে অমূর্ত ব্যক্তিটি জগৎস্রষ্টা বলে অভিহিত তিনিও প্রকৃতপক্ষে কোনো একটা নির্দিষ্ট সমাজরূপে অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত বহিঃশক্তির দ্বারা দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত, মানুষের মনে সামগ্রিকভাবে সেগুলিরই এক অদ্ভুত প্রতিফলন হল ধর্ম, পার্থিব শক্তিসমূহই এই প্রতিচ্ছবিতে অতি-প্রাকৃত শক্তিরূপে প্রতিভাত।

ধর্মের এই অস্তিত্বই তো বিজ্ঞানের, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতায়, ধর্মের ইতিহাস বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অগ্রগতির বিরুদ্ধে এক সংগ্রাম। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অন্ধ নির্মমতার ফলে মহান বিজ্ঞানীরা পীড়িত ও দগ্ধ হয়েছেন, তাঁদের নতুন সৃষ্টি বা আবিষ্কার ও গ্রন্থাদি বর্জন করা হয়েছে, ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। শতাধীর পর শতাধী

ধরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি একরকম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছে, জগতের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নির্দয়ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। ক্রমে প্রকৃতিবিজ্ঞানের উন্নতি ধর্মীয় ও ভাববাদী মনোভাবকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সে জন্যই মার্কসবাদ-প্রবর্তকরাও বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক প্রচারকেই ধর্মের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র হিসাবে তুলে ধরেন। কিন্তু যেহেতু ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা বা দমন করলে ধর্মীয় অনুভূতি আরও প্রবল আকারে দেখা দেবে, সেজন্য মার্কস ও এঙ্গেলস যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় ধর্মের জন্ম ও প্রতিপালন সেই অবস্থাগুলিরই অবসান ঘটাতে চান। মানুষ তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রামেই; এবং বিজ্ঞানসম্মত বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসারেই; ধর্মীয় অনুভূতি ও অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত হবে।

দুর্জ্ঞেয় নৈসর্গিক শক্তিসমূহের কাছে মানুষের অসহায়তার ফলে কাল্পনিক মহামানবের, অর্থাৎ ঈশ্বরের, এবং ক্রমে ধর্মের উৎপত্তি। সভ্যতার বিকাশের পর, বহির্বিশ্বের সক্রিয় সামাজিক শক্তিসমূহের প্রভাব যতদিন মানুষের উপর বর্তমান থাকবে ততদিন পর্যন্তই তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কাল্পনিক প্রতিফলন হিসাবে ধর্ম ও ঈশ্বর মানুষের চিন্তায় বেঁচে থাকবে। মানবমনে ধর্মীয় প্রতিফলনের প্রক্রিয়ার বাস্তব ভিত্তি; (যে উৎপাদনের উপায় মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে, বহিঃশক্তির মতো তার দ্বারাই সে পিষ্ট, নিপীড়িত হচ্ছে) এখনও বর্তমান, তাই ধর্মের পরমায়ুও এখনও শেষ হয়নি। আজও একথা শোনা যায় যে, মানুষ একরকম চায় আর ঈশ্বর, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের বহিঃশক্তি, তার বিপরীত ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞানের দ্বারা তো সামাজিক শক্তিসমূহকে সমাজের অধীনে আনা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক সক্রিয় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা সফল হলে, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ সামগ্রিকভাবে সমাজের আয়ত্তাধীন হবে ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে। তখন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ বর্তমান উৎপাদনব্যবস্থা থেকে, যা তার কাছে দুর্জয় বহিঃশক্তির মতো, মুক্তি পাবে। সেদিন মানুষ নিজেই বহিঃশক্তির উপর আধিপত্য করবে, তার নিজের চাহিদা অনুসারে তা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে এবং বিদ্যমান বহিঃশক্তির ধর্মীয় নির্মোকও অপসারিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে মানবচেতনায় ধর্মীয় প্রতিরূপেরও অবসান হবে, কারণ তখন আর প্রতিফলিত হবার মতো নৈসর্গিক বা সামাজিক বহিঃশক্তি বলে কিছু থাকবে না। এবং তখনই সমাজজীবনে মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার অর্জন করতে পারবে, এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বিচ্ছিন্নতা থেকেও মুক্তি পাবে। (শেষ)

স্বাধীনতা সংগ্রামী, আইনজ্ঞ এবং মহান দানবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

(৫ নভেম্বর, ১৮৭০ - ১৬ জুন, ১৯২৫)

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

২.

১৯০৮ সালে আলিপুর (মুরারিপুকুর) বোমা মামলায় বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ বিনা পারিশ্রমিকে এই মামলায় লড়েন। তখন তাঁর মাসিক আয় ছিল পাঁচ হাজার টাকা। আর এই মামলা পরিচালনা করতে তাঁকে চল্লিশ হাজার টাকা দেনা করতে হয়েছিল। অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে এই মামলা চলে ১২৬ দিন। দু'শর বেশী সাক্ষীকে জেরা করা হয়। ৪০০০ কাগজপত্র এবং ৫০০ জিনিসপত্র প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ ৯ দিন ধরে তাঁর সওয়াল জওয়াবের সমাপ্তি বক্তব্য দেন ।এই মামলায় তিনি যে সওয়াল জওয়াব দেন তা ছিল জ্ঞান ও দেশপ্রেমের অপূর্ব নিদর্শন। বিচারের রায়ে অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পান।

আইন পেশার পাশাপাশি তিনি গোপনে বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৩ সালে কলকাতায় প্রমথ মিত্র ও চিত্তরঞ্জন দাস প্রথমে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি এই সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল।

১৮৯৭-১৯০৪ সাল পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন দাশকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তবে পারিবারিক অবস্থান তাঁর পেশা জীবনের উন্নয়নে কিছুটা ভূমিকা রাখে। কারণ তাঁর পিতামহ ছিলেন সরকারী আইনজীবী। দুই চাচা ছিলেন নামকরা আইনজীবী। এছাড়া তাঁর পরিবারের তিনজন ছিলেন জজ। সুধীরঞ্জন দাশ ছিলেন তাঁদের পরিবারের একজন, যিনি পরবর্তীতে ভারতের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন।

আইনজীবী হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশ সিভিল কোর্টের প্রাকটিসের পরিবর্তে ক্রিমিনাল কোর্টে প্রাকটিস শুরু করেন। এজন্য তাঁকে প্রায়ই মফস্বলে যেতে হত। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন কিন্তু যে কোনও ব্যারিস্টারের চেয়ে ফি নিতেন কম। গরীব মক্কেলের কাছ থেকে কোনও টাকা নিতেন না। তিনি সব সময় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ নিতেন। অনেক সময় দেখা যেত যার পক্ষ নিয়েছেন তিনি দোষী, তখন ওই দোষী ব্যক্তিকে দোষী প্রমাণ করে দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। যে ব্যক্তিই তাঁর কাছে মামলা নিয়ে এসেছেন, তিনিই সবার কাছে তাঁর মহত্বের কথা, বুদ্ধিমত্তার কথা, সততা ও সেবার কথা প্রচার করে বেড়িয়েছেন। এভাবে তাঁর নাম ও পরিচিতি গণমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে

পড়ে। আইনজীবী হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করার পর চিত্তরঞ্জন দাশ মফস্বল ছেড়ে কলকাতায় প্রাকটিস শুরু করেন এবং পুনরায় সিভিল কেসগুলো পরিচালনা করে বেশ সাফল্য পান। সাথে সাথে রাজনীতিতেও পূর্বের চেয়ে বেশী সময় দেন। যার ফলে ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা প্রতিনিধি নির্বাচিত হন তিনি।

'কুতুবদিয়া রাজবন্দী মামলা' দেশবন্ধুকে প্রথম জীবনে একজন আইনজীবী হিসাবে তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করতে সহায়তা করেছে। অন্তরীণস্থল ত্যাগ করে চট্টগ্রাম যাওয়া ছিল এই মামলায় ১৭ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ । চিত্তরঞ্জন দাস তাঁদের জন্য বিনা ফি'তে কাজ করেন। মামলাটি পরিচালনার জন্য এ সময় তিনি প্রায় পক্ষকালব্যাপী চট্টগ্রামে অবস্থান করেন । দেশবন্ধু যুক্তি দেখান যে, রাজবন্দীরা পালিয়ে যাননি বরং জেলা ম্যাজিট্রেটের কাছে কিছু যুক্তিসঙ্গত ও আইনগত দাবীর জন্যে গিয়েছিলেন। তাঁর চমৎকার কৌশলের কারণে বন্দীদের মাত্র দুই মাসের সাজা হয়েছিল।

আইনজীবী হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশের জন্য ১৯০৭ সাল ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময় তিনি সিভিল ও ক্রিমিনাল উভয় কোর্টেই একজন সফল আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিস্থাপন করেন। এ সময় কলকাতা কোর্টে দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের যত মামলা এসেছে তিনি সেগুলোর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়েছেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ অর্থ উপার্জনের জন্য রাজনৈতিক মামলার পাশাপাশি মাঝে মাঝে জমিদার, মহাজনদের মামলাও পরিচালনা করতেন। উপার্জিত অর্থ তিনি গরীব-অসহায় জনগণকে দিতেন এবং তা দিয়ে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনা করতেন। একবার ডুমরাওনের মহারানীর মৃত্যুর পর রাজা কেশোপ্রসাদ তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হতে পেরে মামলা করেন। এই মামলায় চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতি মাসে ১০,০০০ রুপী পেতেন। আর মামলায় জয়ী হওয়ার পর রাজা কেশোপ্রসাদ খুশি হয়ে চিত্তরঞ্জনকে ৫০,০০০ রুপী দেন।

১৯১০ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ 'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ' পরিচালনা করেন। এই মামলার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার অনুশীলন সমিতির প্রধান পুলিনবিহারী দাশ এবং সঙ্গীদেরকে নির্বাসন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ এই রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করেন। তাঁর আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে ৬ মাসের শাস্তি এবং ৩৩ জনের মধ্যে ১১ জনের তুলনামূলক কম শাস্তি হয়েছিল।

১৯১৪ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ ' দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা ' পরিচালনা করেন। এটাও ছিল একটি রাজনৈতিক মামলা। এই মামলার মাধ্যমে তিনি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মামলার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ১৪ জন বিপ্লবীকে লর্ড হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত করে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের তীক্ষ্ম যুক্তির কাছে ইংরেজ সরকার হেরে যায় এবং তিনি জয়ী হন।

আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বিপ্লবীদেরকে ব্রিটিশদের অত্যাচার-নির্যাতন ও জেল-জুলুমের হাত থেকে বাঁচানো ছিল তাঁর প্রথম কাজ। আর দ্বিতীয় কাজ ছিল সরাসরি স্বদেশী রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকা এবং পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার জন্য কাজ করা। যে কারণে তিনি ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯১৮ সালে 'আলিপুর ট্রাঙ্ক মার্ডার কেস' মামলা থেকে তিনি পাঁচ জন ব্যক্তিকে মুক্ত করেন। এই মামলাটি'আলিপুর ট্রাঙ্ক মার্ডার কেস, ১৯১৮' নামে পরিচিতি । ওই বছর চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা হল 'অমৃতবাজার পত্রিকা মামলা'। কলকাতা হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ অভিমত প্রকাশ করে যে, কলকাতা উন্নয়ন ট্রাস্ট কোনো ব্যক্তিগত জমি রাখতে পারবে না। একই সময় হাইকোর্টে অন্য একজন বিচারক রায় দেন যে, কলকাতা উন্নয়ন ট্রাস্ট সেই ক্ষমতা রাখে। এরকম বিপরীতধর্মী মতামতের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের একটি স্পেশাল বেঞ্চ গঠন করা হয়। প্রধান বিচারপতি Sir Lancelot Sanderson, বিচারপতিJonh Woodroffe এবং Mr. Chitty নিয়ে এই বেঞ্চ গঠন করা হয়। কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা অমৃতবাজার এ ব্যাপারে মন্তব্য করে সম্পাদকীয় ছাপে। পত্রিকাটি স্পেশাল বেঞ্চের গঠন সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে। এই অবস্থায় প্রধান বিচারপতি অমৃতবাজারকে শোকজ করেন এবং আদালত অবমাননার অভিযোগ আনেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' তখনকার কলকাতা বারের প্রখ্যাত আইনজীবীদের নিযুক্ত করে। মি. জ্যাকসন, মি. নরটন, বোমকেশ চক্রবর্ত্তী এবং চিত্তরঞ্জন দাশ এই মামলায় নিযুক্ত হন। স্বাভাবিকভাবেই মামলা শুরু করেন মি. জ্যাকসন। কিন্তু পরবর্তিতে একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশ ছাড়া আর কেউই মামলা পরিচালনা করার জন্য ছিলেন না। তিনি একাই অমৃতবাজার পত্রিকার পক্ষে লড়েন এবং বিচারকদের রায় চিত্তরঞ্জন দাশের পক্ষে অর্থাৎ অমৃতবাজার পত্রিকার পক্ষে যায়।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরে ব্রিটিশ সরকার জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড চালায়। এ হত্যাকাণ্ডে ৩৭৯ জন নিহত এবং প্রায় ১১০০ জন আহত হয়েছিল। ইতিহাসে এটাই 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। ব্রিটিশ সরকারের নানা টালবাহানার পর এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচারের জন্য সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, সদস্য ছিলেন চিত্তরঞ্জন

দাশ, মতিলাল নেহেরু, আব্বাস তৈয়্যবজী এবং ড. জাকির হোসেন। তদন্ত কমিটির অধিকাংশ খরচ বহন করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি তদন্ত কমিটিতে তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। যে কারণে হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠ তদন্ত বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল।

এছাড়াও তিনি মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার এবং পাঞ্জাবে সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনসভা বর্জন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি নিজেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপন করেন এবং গান্ধীজীর ডাকে ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বয়ং ভারত সরকার প্রখ্যাত মিউনিশনস বোর্ড ঘটিত মামলায় প্রচলিত নজীর উপেক্ষা করে সাহেব এডভোকেট জেনারেল অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক দিয়ে তাঁকে সরকারি কৌসুলী নিযুক্ত করেন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি এ দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। এই অসামান্য ত্যাগের জন্য ভারতবর্ষের জনগণ কর্তৃক তিনি 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন।

দেশবন্ধু সম্পর্কে মওলানা আবুল কালাম আজাদ

দেশবন্ধু সম্পর্কে মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর india wins Freedom (ভারত স্বাধীন হল) গ্রন্থে লিখেছেন' আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি এক অতি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ।। তাঁর ছিল যেমন অগাধ দূরদর্শিতা, তেমনি ছিল কল্পনার ব্যাপ্তি ।..... কলকাতায় ব্যারিস্টার হিসেবে তাঁর ছিল প্রচণ্ড পসার এবং তিনিছিলেন এদেশের সফল ব্যবহারজীবীদের একজন। লোকে এও জানত যে, তিনি ভোগবিলাসপ্রিয় । কিন্তু বিনা দ্বিধায় এক মুহূর্তে আইনের ব্যবসা ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে খদ্দরধারী হয়ে কংগ্রেসী আন্দোলনে তিনি সর্বান্তকরণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমার মনে তিনি গভীরভাবে ছাপ ফেলেন। আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে আমি তাঁকে সবচেয়ে শক্তিমান একজন ব্যক্তি বলে মনে করি।

গুপ্ত বিপ্লববাদীদের সঙ্গে দেশবন্ধুর সম্পর্ক

১৯২১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেয়ার জন্য দেশবন্ধু কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি করা হয়। অনুশীলন সমিতির খ্যাতনামা বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ওরফে মহারাজ তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম গ্রন্থে' লিখেছেন আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাসিত বাংলার বিপ্লবীদের, যাঁদের দ্বিতীয় ঢাকা ও বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় আন্দামানে দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছিল তাঁদের অনেককে ১৯২১ সালের শেষ দিকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের আলিপুর জেলের ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে বন্দী করে রাখা হয়। ওই ওয়ার্ডের নাম হয়ে যায় 'বোম ওয়ার্ড'। এই বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ (ময়মনসিং ১০ বছর), অমৃতলাল হাজরা (মানিকগঞ্জ ১৫ বছর), মদন ভৌমিক (ঢাকা ১০ বছর), খগেন চৌধুরী (মানিকগঞ্জ ৭ বছর),আশুতোষ লাহিড়ী (পাবনা ১০ বছর), গোপেন্দ্রলাল রায় (পাবনা ১০ বছর), ফনিভূষণ রায় (কুষ্টিয়া ১০ বছর), প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (শ্রীহট্ট ৮ বছর), মথুর চক্রবর্তী (কুমিল্লা ৮ বছর), সুধীর মজুমদার (পাবনা ৮ বছর), অতুল দত্ত (কুমিল্লা ৮ বছর), নিকুঞ্জ পাল (কুমিল্লা ১০ বছর), গোবিন্দ কর(ঢাকা ১০বছর), হরিচৈতন্য দে (বরিশাল ১০ বছর), নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী (নোয়াখালী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর), সত্য বসু (বরিশাল যাবজ্জীবন), যতীন নন্দী (ময়মনসিং যাবজ্জীবন), অনুকুল চ্যাটার্জী (হুগলী যাবজ্জীবন), ভুপেন ঘোষ (কলকাতা যাবজ্জীবন), নিখিল গুহ রায় (ফরিদপুর যাবজ্জীবন),সুরেন্দ্র বিশ্বাস(বরিশাল যাবজ্জীবন), নরেন ব্যানার্জী (ফরিদপুর ১০ বছর), মোহিনী বসু (ফরিদপুর ৮ বছর) । মহারাজের লেখা থেকে জানা যায় বম ওয়ার্ডে শ্বেতাঙ্গ প্রহরী রাখা হয়েছিল।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দেশবন্ধু

১৯২১-এ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে বাংলার জেলগুলি সত্যাগ্রহী বন্দীতে ভরে যায়। জেলে আর বন্দী রাখার জায়গা ছিলনা। তখন সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে দূরে নির্জন কোনও জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হত। জেলে বহু অসহযোগী রাজবন্দী থাকলে জেল চালানো সমস্যা হয়। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিরাট সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মীকে এই সময়ে গ্রেপ্তার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি করা হয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে নিয়ে আসা হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ,আবুল কালাম আজাদ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আক্রম খান, মৌলানা মুজিবর রহমান (নেহালপুর, বসিরহাট), পীর বাদশা মিঞা (ফরিদপুর), ডা. বিধানচন্দ্র রায়, কবি নজরুল ইসলাম , সতীন সেন ও শরৎচন্দ্র ঘোষ(বরিশাল), হেমন্ত সরকার, বসন্তলাল মুরারকা, বসন্তমজুমদার(কুমিল্লা), মহিমচন্দ্রদাস (চট্টগ্রাম), হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত(করাটিয়া, জমিদার), কিরণশঙ্কর রায় (তেওতা,জমিদার),জে.এল.ব্যানার্জী, চিরঞ্জন দাস (দেশবন্ধুর পুত্র),

ডা. সুরেশ ব্যানার্জী(ফরিদপুর), ত্রিপুরা চৌধুরী , চাঁদমিয়া সাহেব, পদ্মরাজ জৈন, প্র নৃপেন ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দসহ অসংখ্য সত্যাগ্রহীকে ওই সময় আলিপুর জেলে বন্দী করা হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ লিখেছেন ‘নেতারা সকলেই বোম ইয়ার্ডে আসিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছেন , আমরাও পরে তাঁহাদের ইয়ার্ডে গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। নেতাদের প্রত্যেকেই আমাদের স্নেহ করিতেন ও তাঁহাদের বাড়ি হইতে যে সব খাদ্যদ্রব্য আসিত আমরা তাহার ভাগ পাইতাম।’ বিপ্লবীরা প্রায় এক দশক বাড়ির বাইরে ছিলেন ও তাঁদের জেলে কেটেছে। কলা , কমলা, রসগোল্লা, গুড় প্রভৃতির স্বাদ তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁদের মনে হল তাঁরা আবার বাংলায় ফিরে এসেছেন ও জেলের বাইরে আছেন। এখন তাঁরা ইয়ার্ডের বাইরে যেতে পারেন। সকলের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন। যুবক সত্যাগ্রহীরা অনেকে তাঁদের অনুগামী হয় পড়লো। এতে কিছু উপনেতার গাত্রদাহ হতে লাগলো। তাঁরা গিয়ে দেশবন্ধুর কাছে অভিযোগ করলো যে বম ইয়ার্ডের লোকেরা হিংসার কথা বলে যুবকদের মাথা বিগড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। মহারাজ লিখেছেন ‘দাশ মহাশয় তাহাদের কথায় প্রথমে কর্ণপাত করেন নাই , পরে একদিন তাহাদিগকে বলিলেন, ‘ইহাদের কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আমার সকল অহংকার চূর্ণ হইয়া যায়।’ ইহার পর আর কেহ দাশ মহাশয়ের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে সাহস পায় নাই। আমরা দাশ মহাশয়ের ভক্ত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একদিন তিনি আমাকে ও শশাঙ্কবাবুকে (অমৃতলাল) নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার পাশে বসাইয়া খাওয়াইয়া ছিলেন। সুভাষবাবু আমাদের পরিবেশন করেন।’

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ওই সময় আন্দামান সেলুলার জেল থেকে আনীত বন্দীদের মধ্যে মদনমোহন ভৌমিক ছিলেন অন্যতম। তিনি তাঁর ‘আন্দামানে দশ বৎসর ‘ গ্রন্থে এই আলিপুর জেলের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বন্দীদের ‘ নন - কো বন্দী ‘ বলে উল্লেখ করেছেন। এই বন্দীরা যুবা , প্রৌঢ় নির্বিশেষে বোম ওয়ার্ডে এসে বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁরা বিপ্লবীদের দীর্ঘ কারাজীবনের কথা শুনে হতবাক হতেন এবং নিজেদের স্বল্প কারাবাসের কষ্ট ভুলে যেতেন। অল্প বয়সের ছেলেরা চার ছয় মাসের কারাদণ্ড পেয়ে কাতর হয়ে পড়ত,তাঁদের দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ডের কাহিনী বলে বিপ্লবীরা সান্ত্বনা দিতেন। নেতাদের ভিতর কেউ কেউ সন্দেহ করতেন বিপ্লবীরা অহিংসার বিরুদ্ধে বলে ছেলেদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছেন। এই সব নেতারা ছেলেদের কাছে বিপ্লবীদের নামে কিছু বললে ছেলেরা মুখে মুখে কোনও উত্তর না দিলেও, পরে এসে সব কথাই বিপ্লবীদের জানিয়ে যেতো।

শ্রী ভৌমিক লিখেছেন প্রায় সকল নন - কো নেতাই তাঁদের বোম ওয়ার্ডে এসে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করে আনন্দ দিতেন। তবে কাজী নজরুল ইসলাম , নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী , পদ্মরাজ জৈন, সুরেশ ব্যানার্জী,হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সুযোগ পেলেই তাঁদের কাছে আসতেন ও নানা বিষয়ে আলাপ করতেন। ভৌমিক তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিপ্লবী যুবকদের প্রতি ছিল অসীম স্নেহ। তিনি বিপ্লবীদের সম্পর্কে কোনও সমালোচনাকেই আমল দিতেন না। বাড়ি থেকে তিনি ও অন্যান্য নেতারা ভালো খাবার , ফলমূল ইত্যাদি আনিয়ে বিপ্লবী যুবকদের পাঠাতেন। সারা জেলখানার বন্দীদের দেখে এসে দাশ মহাশয় বোম ওয়ার্ডে এসে বসতেন ও নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি ছিলেন তেজস্বী ও স্পষ্ট বক্তা। তাঁর পুত্র চিররঞ্জন, স্ত্রী বাসন্তী দেবী, বোন ঊর্মিলা দেবী সকলেই কারারুদ্ধ হন। তাঁদের মুক্তির জন্য বিশিষ্ট আইনজীবী বি.সি.চ্যাটার্জী উদ্যোগী হলে দেশবন্ধু তাঁকে নিবৃত্ত করেন। তিনি বলেন ‘ দেশবাসী যখন আমার আহ্বানে কারাবরণ করছেন , তখন আমার বাড়ির মানুষদের সর্বপ্রথম কারাবরণ করা উচিত।’ দেশবন্ধু যখন জেলে অসুস্থ হন, তখন বিপ্লবী যুবকরা তাঁর সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে শ্রীভৌমিক উল্লেখ করেছেন।

(চলবে)